পাশ বালিশ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

পাশবালিশ

সূচীপত্র

হালুইকর ও যোগাড়ে ৯ • বরবাদ ১১ • মনুষ্য হব ১৩
• ইয়ে ১৭ • ফন্দু ২৬ • নির্জনতায় আমরা ভয় পাই ৩৫
• কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরোলেই পাজি ৩৯
• উতল দখিণ বাতাসে ৪৩
• যে ট্রেন থামে না যার কোন ইষ্টিশন নেই ৪৮
• তোমার ম্যাও তুমি সামলাও ৫৩ • হাসতে মানা নেই ৫৭
• কী হল দাদা ৫৯ • প্রশ্নোত্তরে দুর্গোৎসব ৬২
• ফাবেড়িক ৬৭ • পাশবালিশ ৮৩ •

আমাদের প্রকাশিত
শ্রী সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের অন্যান্য বই

মামা সমগ্র (১ম ও ২য় খণ্ড)

হেড স্যার ■ গুপ্তধনের সন্ধানে ■ বুটেল ■ ফাটাফাটি ■ ক্যাচকোঁচ সুন্দরী বউ ■ হনুমান টুপি ■ সুইট এন্ড সাওয়ার ■ কেস জন্ডিস স্যাটাস্যাট ■ ল্যাং মারো ল্যাং ■ মিলেনিয়াম ■ যদি হই মুখ্যমন্ত্রী জুতোচোর হইতে সাবধান ■ আড়ং ধোলাই ■ দ্বিতীয়পক্ষ ■ বুনো ওল আর বাঘা তেঁতুল ■

শ্রেষ্ঠ গল্প (১ম, ২য়, ৩য়)

হালুইকর ও যোগাড়ে

আমি মনে করি ঘরসংসারের কাজে স্ত্রীকে সাহায্য করা উচিত। স্ত্রী নিশ্চয় কৃতদাসী নয়। সারাদিন ফাইফরমাশ খেটে মরার জন্যে সেই ভালোমানুষের মেয়েটিকে সংসারে আনা হয়নি। পঞ্চাশ বছর আগে বাঙালি পরিবারে যা হত সেটাকে আদর্শ করে বসে থাকলে চলবে না। এতে প্রাচীনপন্থীরা রেগে গেলে আমার কিছু করার নেই। সংসারে স্বামী স্ত্রী হল টু কমরেডস। "আমরা দুজনা স্বর্গ খেলনা রচিব গো ধরণীতে"।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই আমার প্রথম কাজ হল গ্যাস জ্বেলে কেটলিতে জল চাপান; তারপর মুখটুক ধুয়ে জলসিক্ত ঠাণ্ডা হাতটা স্ত্রী গলার কাছে রাখা। সে অমনি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বিছানা থেকে নেমে পড়বে। আমি দাঁত বের করে হাসতে থাকবো। ইংরেজিতে বলে, 'অলওয়েজ ওয়্যার এ স্মাইলিং ফেস।' সকালের সূর্য ও সকালের হাসিমুখ জীবনের ভার হালকা করে দেয়। এরপর আমি একটু ছেলেমানুষি করি। ছেলেমানুষ স্বামীকে মৃত্যুর পর স্ত্রীরা অনেকদিন মনে রাখে। সে বাথরুমে ঢোকামাত্র বাইরে থেকে বাথরুমের দরজার ছিটকিনিটা আটকে দি। দিয়ে চিৎকার করতে থাকি, বন্দী বন্দী। সে দরজায় দুমদাম ধাক্কা মারতে থাকে। পাড়ার লোক চমকে চমকে ওঠে। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, 'মরনিং শোজ দি ডে'। সকালটা মজা করে শুরু করি যাতে সারাটা দিন মজায় কাটে।

এরপর আমি নেমে পড়ি গৃহকর্মে। প্রথমত সেই ঠোঁটে সিগারেট হাতে ব্যাগ, বাজার কাম মরনিং-ওয়াক কাম ফাঁকিবাজি। ওতো সব স্বামীই করে। হালুইকরের যোগাড়ের মতো রান্নাঘরে আমার তৎপরতা শুরু হয়। যেমন, প্রেসার কুকারে ভাত চাপিয়ে আমার স্ত্রী স্নানে যায়। যাবার সময় বলে যায়, 'একটা জায়গায় গোটা চারেক আলু সেদ্ধ করতে দেবে।'

নারী জাতির সঙ্গে জল আর সাবানের যেমন প্রীতি, পুরুষজাতির সঙ্গে সেইরকম সকালের সংবাদপত্রের। সকালে সময় খুব কম, ফলে বিধিতি নিয়মে একই সঙ্গে দুতিনটে কাজ চালাতে হয়। আধুনিক গৃহবিন্যাসে, বসার ঘর, শোবার ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম সব পাশাপাশি। একটি চতুষ্কোণে মাপজোক করে বসানো। কাগজে ত্রিপুরা, মেঘালয়। গ্যাসে প্রেসার কুকার। কখন প্রেসার কুকার রকবাজ বখাটের মতো স্ত্রীজাতির উদ্দেশ্যে প্রথম সিটিটি মারবে, আমার আর সে

খেয়াল থাকে না। কাগজের মুখরোচক রাজনৈতিক মেনু আমার মন কেড়ে নেয়। ওদিকে সিটির পর সিটি শুনে, শ্যামসুন্দরের বাঁশির ডাকে বিগলিত রাধিকার মতো আমার 'সুন্দরী' সিক্ত বসনে বাথরুম থেকে তেড়ে বেড়িয়ে আসে। রাধিকে ছুটতেন যমুনার দিকে, 'আর বাঁশি বাজায়ো না শ্যাম বলে।' আমার স্ত্রী লেডি টারজন কিমি কাফকারের মতো রান্নাঘরের দিকে ছোটে এই বলতে বলতে—'যাঃ সর্বনাশ, হয়ে গেল। এই লোকটাকে দিয়ে যদি কোনও একটা কাজ হয় ভগবান!' তখন আমিও ছুটে যাই কাগজ ফেলে। বেড়ালের মিউ মিউ স্বরে বলতে থাকি, 'কটা সিটি মারল গো। কটা সিটি মারলো!'"

'গলে পাঁক হয়ে গেল। কোন জগতে ছিলে?'

পাঁক নয়। কি যে হল, বোঝা যায় আহারে বসে। পুরো একটা ঢাকা দমো বরফি বেরিয়ে এল। রাইসকেক। উলবোনার কাঁটা দিয়ে ফুটোফুটো করে ডাল ঢোকাতে হল। সেও তো এক নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা। এই তো জীবন। তারপর একদিন মাছ কুটেছিলুম। ডিসেকসানে সামান্য ভুলচুক হওয়ায় সেই মাছের পিত্তি হয়ে গেল করলা। টু ইন ওয়ান, মাছও হল সুক্তোও হল। রান্নার নতুন দিগন্ত খুলে গেল। রুটি আর লুচি আজীবন সবাই গোলই দেখে এসেছেন, আমি আমার প্রতিভায় তার গঠনে অদ্ভুত অদ্ভুত সব আকৃতি আনতুম। কোনওটা অ্যামিবার মতো, কোনওটা এক্টোপ্লাজম, প্রোটোপ্লাজমের মতো। আমার জীবনসঙ্গিনী বলতেন, 'সাহায্য করতে এসে কেন আমার কাজ বাড়াচ্ছ। কুচুটে মনের লোকেরা দুটো জিনিস কিছুতেই পারবে না, সরলরেখা টানতে আর গোল করে রুটি আর লুচি বেলতে।' আমি হাসতুম। মর্ডান আর্ট সম্পর্কে মহিলার কোনও জ্ঞানই নেই। আধুনিক গান, আধুনিক শিল্প হল ফ্রিস্টাইল ব্যাপার। আমি একবার সরষে বেটে সাহায্য করতে চেয়েছিলুম। সেই প্রথম আর সেই শেষ। মনে হচ্ছিল, অফিস টাইমে শেয়ালদা স্টেশানের তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মের ওপর নোড়া চালাচ্ছি। যত চাপ দি ততই হাত গড়িয়ে যায়। নোড়া স্লিপ করে যায়। সরষে নয় তো, অসংখ্য বল-বেয়ারিং। শেষে আরও শক্তি প্রয়োগ করতে গিয়ে নোড়া হড়কে শিলের ওপর কুপোকাত। টেনে তুলতে তুলতে আমার স্ত্রী বলেছিল 'গায়ের জোরে পেষা যায় না, নরম করে, সোহাগ করে পিষতে হয়।' এরপর তোমাকে আমি কি সাহায্য করতে পারি', বলে সামনে হাজির হলেই, সে ভয় পেয়ে যেত, 'না না, তোমাকে কিছু করতে হবে না। তুমি তোমার কাজে যাও।'

আমার সেই রান্নাঘর আছে। গ্যাস আছে। প্রেসার কুকার আছে। বাথরুমটিও আছে। নেই সেই ভেতরে বন্ধ করে রাখার মানুষটি। মহাকাল হালুইকরটিকে নিয়ে চলে গেছে। যোগাড়ে এখন আর কাকে যোগাড় দেবে।

বরবাদ

একটা মুখ সরু ফুলদানিতে একতাড়া রজনীগন্ধার স্টিক গুঁজলে যে-অবস্থা হয় আমার ঠিক সেই অবস্থা। নড়াচড়ার উপায় নেই। একেবারে ঠাস হয়ে আছি। বাস চলেছে গুড়গুড় করে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি। হিটলারসায়েব এখনও বেঁচে আছেন। আমরা হলুম গিয়ে পোলিশ জু। আমাদের কনসেন্ট্রেশান ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ওয়াগনে গাদাই করে। বাস চলেছে ওঠা-পড়া প্রেমের তুফানের মতো। রাস্তা হল নানা মাপের গর্তের মালা। তাঁরা বলেন, মানে যাঁরা আমাদের জাতির কাণ্ডারী, তল আর অতল এই নিয়েই তো পৃথিবী। দিন আর রাত এই তো বিধির বিধান। তাহলে তো ভগবানকেই বলতে হয়, আপনার করপোরেশানে এ কি অব্যবস্থা, রাতকে হোয়াইটওয়াশ করে সাদা করে দিন, আমাদের অসুবিধে হচ্ছে। একজন বললে, বেশি ট্যাফোঁ করলে পৃথিবীর বাইরে বেয়ারিং পার্সেল করে দেওয়া হবে। হাতে খেঁটে লাঠি, মাথায় হেমলেট, নজরে পড়েছে? চাবকে চাপকান করে দেবে। দেশে এখন একবাদ, তার পাশে প্রতিবাদ থাকতে পারে না। বাদ মানে মাইনাস। সব বাদ। বরবাদ।

তাই আমরা আর কিছু বলি না। কৌতুকা বড় সাঙ্ঘাতিক জিনিস। যদি প্রশ্ন করেন, 'কেমন আছ?'

এক গাল হেসে বলব, 'ফাশক্রশা।'

রজনীগন্ধা ভেবে বেশ আনন্দ পাই। পায়ের দিকটা হল স্টিক। ডবল স্টিক। মাথার দিকটা ফুল। চলন্ত ফুলদানি। হঠাৎ পাশের ভদ্রলোক বললেন, 'মাঝে মাঝে অমন ডিঙ্গি মেরে তেউড়ে উঠছেন কেন? হলটা কী? ইস্প্রিং খেয়ে বেরিয়েছেন না কী?'

এক জেনারেশান পরের কেউ হলে বলত, 'বেশ করেছি।' পৃথিবীতে একটা করে যুগ এসেছে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি। এ-যুগটা হল, 'বেশ করেছি যুগ'। আমি বিনীতভাবে বললুম, 'আজ্ঞে, আমার জুতোর মধ্যে কি একটা ঢুকেছে।'

'তা ঢুকেছে তো বের করে দিন। তিড়িংবিড়িং করার কি আছে? আমরা ডিস্টার্বড্ হচ্ছি। সিভিক সেন্‌স নেই।'

আজ্ঞে, ভীষণ আছে। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে হাঁচি। আবার সরি বলি পাবলিক প্লেসে হিসি করি না। ফিতে বাঁধা জুতো তো তাই বেকায়দা হয়ে গেছি।'

ও-পাশ থেকে একজন প্রশ্ন করলেন, 'কি ঢুকেছে বলে মনে হয়? নরম, নরম?'

'বুঝতে পারছি না, তবে কুরকুর করছে।'

'কুরকুর! তার মানে লেঙটি ইঁদুর।'

সঙ্গে সঙ্গে আর একজন বললেন, 'তেতুঁলে বিছেও হতে পারে। রোল হয়ে বসে আছে।'

তিনি খিঁচুনি খেলেন, 'জুতো কি রোলকাউন্টার? মাটন রোল হয়ে বসে আছে? জাতটাকে রোলে পেয়েছে। ডেফিনিটলি ওটা কাঁকড়াবিছে। কাঁকড়াবিছে ডিস্কো ড্যান্স করতে ভালোবাসে। ওদের ডেরাই হল জুতো। আপ্রাণ চেষ্টা করছে হুলটাকে রিলিজ করিয়ে ছপাং করে এক ছোবল মারার।

এক ভদ্রলোক খুব ঘনিষ্ঠ গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'পায়ের মাপ কত?'

'ছয়।'

'জুতোর মাপ নিশ্চয় সাত।'

'ঠিক ধরেছেন।'

'লিভার খারাপ। পায়ে কড়া আছে। ওই এক সাইজ বড়, তার মধ্যেই বসে আছে ঘাপটি মেরে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে তো? ওটা বোরা সাপ। কয়েল করে থাকে।'

আমার সামনেই এক ভদ্রলোক বসেছিলেন। তাঁর দয়া হল। তিনি বললেন, 'আমার জায়গায় বসে জিনিসটাকে রিলিজ করুন।' সঙ্গে সঙ্গে সবাই হাঁ হাঁ করে উঠলেন, 'সে কী, আমাদের লাইফ অ্যাট রিস্ক। বেরিয়েই অ্যাটাক করবে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'মানবতার প্রশ্ন। এঁকে কামড়ালে কি হবে? আপনি খুলুন। দেখা যাক মালটা কী?'

ফিতে খুলে জুতোটা ঠুকতেই একটা প্রমাণ মাপের আরসলা সামনের সুন্দরী এক মহিলার কপালে গিয়ে বসল ফড়াং করে। আরসলাদের মহিলাসক্তি প্রায় চরিত্রহীনতার পর্যায়ে পড়ে। ভদ্রমহিলা ভয়ঙ্কর রকমের এক চিৎকার করে সামনে দাঁড়ানো এক যুবককে সপাটে জড়িয়ে ধরলেন। প্রাথমিক আতঙ্ক কেটে যাবার পর ভদ্রমহিলা বললেন, 'অসভ্য, ইতর। বাড়ি থেকে আরসলা এনে মেয়েদের গায়ে ছাড়েন। অ্যান্টিসোস্যাল।'

সঙ্গে সঙ্গে একজন ফোড়ন কাটলেন, 'শুধু আরসলা নয়, জুতোর আরসলা।'

যুবকটি নেমে আমার কানে কানে বললেন, 'কালও একটা আরসলা আনবেন। পরপর তিনদিন হলেই আমি টার্গেট রিচ করে যাব।

মনুষ্য হও

সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিলেন, 'মনুষ্য হও।'

পিতাকে প্রণাম করি, তিনি আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হস্তের একটি মুদ্রা করিয়া অমিতাভ বুদ্ধের ছন্দে বলিতেন, 'মানুষ হও।' শিক্ষক মহাশয়কে প্রণাম করিতাম, তিনি বলতেন, 'মানুষ হও।' বিদ্যালয়ে বেধড়ক পিটাইবার কালে আমার জাতি আবিষ্কার করিয়া, আমার বদলে তিনিই আর্তনাদ করিতেন, 'ওরে বাঁদর, তোকে মানুষ করতে গিয়ে হাতে কালসিটে পড়ে গেল।'

একদা পরম প্রহৃত হইবার পর সাশ্রু নয়নে বলিয়াছিলাম, মানুষের বাচ্চা তো মানুষই হইবে, বস্তুত হইয়াই আছে, দুইটি পা, দুইটি হাত, দুইটি চক্ষু, গোলাকার মস্তক, বড় বড় কৃষ্ণকেশব চুল ছিল, আপনার আকর্ষণ হইতে বাঁচিবার জন্য কদমছাঁট করিয়াছি। মানবে বানর দর্শন আপনারই দৃষ্টি বিভ্রম। স্বামীজি বলিয়াছেন, আমি পুস্তকে পাঠ করিয়াছি, "বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।"

এতটা গুছাইয়া বলিতে না পারিলেও, নিজের শ্রেণি অনুযায়ী অকুতোভয়ে এই ভাবই ব্যক্ত করিয়াছিলাম। ফল হইল উলটা। বেত্র আস্ফালন সহ নৃত্য করিতে করিতে তিনি বলিতে লাগিলেন, 'এই বিচ্চুটা শুধু বাঁদর নয় পাকা বাঁদর। সাধে রামায়ণে বাঁদরও দেবতা। তোর বহুরূপের নিকুচি করেছে।' তুলো ধোনা হয়ে তিনদিন তোশকের মতো তক্তাপোশে পড়ে রইলুম। পিতা অত্যন্ত খুশি হয়ে বললেন, 'বেশ হয়েচে, অল্প বয়সে পেকে ঝুনো হয়ে গেছে। লেজটা পেছনে কয়েল করা আছে। ছুরি দিয়ে একটু ওপন করে দিলেই বেরিয়ে আসবে। ওর ডজন ডজন কলা খাওয়া দেখেই বুঝেছিলুম, এই মহামানব নর নয় 'নরপশু।'

বিবাহের পর আমার স্ত্রী আমাকে অন্যভাবে আবিষ্কার করলেন, আমি একটা ঢেঁড়স। সারাটা জীবন ঢেঁড়সের প্রাপ্য সম্মানও পেলুম না। পাপোশ হয়ে পড়ে রইলুম সংসারের চৌকাঠে। চিৎকার, চেঁচামেচি করেও কোনো লাভ হল না। জ্যোতিষী বললেন, 'রবি ডাউন। মঙ্গল উইক, বৃহস্পতি বেখাপ্পা, একটা গ্রহও ঘাটে নেই। এবারটা গোলেমালে কাটিয়ে দিন। আসছে বার বাবাকে বলবেন, হাতে পাঁজি, ঠোঁটে বাঁশি নিয়ে বসে থাকতে। যেই দেখবেন গ্রহরা বেশ চড়ে আছে, অমনি বাঁশিতে ফুঁ, সার্জেন সঙ্গে-সঙ্গে ফরসেপ দিয়ে মারবে টান। যখন তখন জন্মালে হয়!'

যুগ ইতিমধ্যে পালটে গেল। এগলো না পেছলো বোঝা মুশকিল। ছেলেকে বললুম 'মানুষ হও।'

সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা প্রশ্ন, 'মানুষ হওয়া কাকে বলে? তোমার মতো মানুষ হতে চাই না। দাঁত বের করে হাস, আর ঘাড় কাত করে থাক। জ্ঞান হওয়া তক শুনে আসছি—Plain living and high thinking. প্লেন লিভিং মানে জ্ঞান, যারা এয়ারো প্লেনে বাস করে। আজ লন্ডন কাল ন্যুইয়র্ক। আর হাই থিঙ্কিং হল, বোতল খানেক স্কচ মেরে হাই হয়ে চিন্তা করে, কার টুপি কাকে পরাবে। তোমার ওই বুনো রামনাথের তেঁতুল পাতার ঝোল খাওয়ার গল্পটা ব্যাক ডেটেড। এ হল ঠেলাঠেলির যুগ। Push or Perish. তোমার প্রাগৈতিহাসিক শিক্ষা কাজে লাগাতে গিয়ে পদে পদে হোঁচট। বিনীত হয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গেলুম, তিনি বললেন, আদিখ্যেতা। সাহায্যের হাত বাড়াতে গেলুম, বললে, নিজের চরকায় তেল দাও। বিনয়ী হতে গেলুম, বললে, মেয়েছেলে। সম্মান দেখাতে গেলুম, বললে, ন্যাকামো।' ভেবে দেখলুম, কথাটা অতিশয় ঠিক। গদগদ, গদগদ ভাব, যেন মাতার কী পিতার শ্রাদ্ধ, যেন উমেদার কী সাহায্যপ্রার্থী, এই কায়দায় চলতে গেলে উপেক্ষা ছাড়া কপালে কিছু আর জুটবে না। একালের ভিখিরিদেরও কী দাপট। এক মিনিট দাঁড়াবার সময় নেই। একগালে সাবান, আর এক হাতে বুরুশ, 'একটু দাঁড়াও না ভাই, দেখছ তো সবে ধরেছি!'

আপনার দাড়ি কামান দেখতে আসিনি। এই নিয়ে তিনবার আমার মা মারা গেল। এত শ্রাদ্ধ কে করবে। পঁচিশ, পঞ্চাশ যা পারেন ছেড়ে দিন।'

'তোমার এত মা এল কোথা থেকে, ছেলে তো দেখছি একটা!'

'আমার বাবা যে কুলীন ছিলেন। আমি যে ভাগের ছেলে।'

'এই তিন মায়েতেই মা শেষ!'

'কে বলেছে! আবার সামনের মাসে একটা মরবে, লাইন দিয়ে আছে। অত কোশ্চেনের কী আছে। দেবেন তো কটা টাকা। দাড়ি কামাতে কামাতে দেওয়া যায় না। আমাদের সময়ের দাম আছে।'

হঠাৎ অস্কার ওয়াইল্ডের একটি লেখায় দুটি লাইন চোখে পড়ল, 'Moderation is a fatal thing. Nothing succeeds like excess. মিউ মিউয়ের যুগ শেষ। বাড়াবাড়ির যুগ চলছে। পরস্পর পরস্পরকে লাথি মারার যুগ। বিনয় অহংকারেরই আর এক রূপ। লোকটি বড় বিনয়ী, অর্থাৎ লোকটি অতিশয় অহঙ্কারী। আগুন অথবা বরফ দুটোই দহন করে। ধরা যায় না ছেঁকা লাগে।

বৃদ্ধ মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনি আমাকে মানুষ করতে চেয়েছিলেন। মানুষের সংজ্ঞাটা বলেননি।'

বীতশ্রদ্ধ শিক্ষকমশাই বললেন, 'এ বাঁদর ইজ বেটার দ্যান এ ছাগল। ছাগল বলি হয়ে যায়, বাঁদর বলি হয় না। আমি এক ছাগল, সারা জীবন বাঁদরদের ছাগল করতে চেয়েছি। এখন শেষ জীবনে নিজে একটা রামছাগল হয়ে বসে আছি। শোনো বাবা, দার্শনিক সোরেন কির্কেগার কী বলছেন, বড় সুন্দর কথা—Life can only be understood backwards. but it must be lived forwards. জীবন বুঝতে হলে ফেলে আসা পথে হাঁটতে হবে, সে তো সম্ভব নয়, পথ যে সামনে। এ এমন এক গাড়ি যার ব্যাক গিয়ার নেই। এইবার এসো এডনা সেন্ট ভিনসেন্টের কথায়, it is not true that life one damn thing after another—it's one damn thing over and over. দেহ খাঁচায় ঢোকাটাই one damn thing. তবু মানুষ আসবে। তুমি কী নিজের ইচ্ছেয় এসেছিলে? আমি কী নিজের ইচ্ছেয় এসেছিলুম?''

—না স্যার! হঠাৎ একদিন আবির্ভাব করলুম এসে গেছি। মাঠে ছুটছি, স্কুলের বেনচে বসে আছি। কেউ কান ধরে টানছে, কেউ ডাস্টার দিয়ে পেটাচ্ছে। একজনকে মা বলছি, একজনকে বাবা। শাসক পিতা, স্নেহময়ী মাতা। যেই জ্বর হল, বাবা বললেন, কোঁ কোঁ করতে দাও। যেমন কর্ম তেমন ফল, অত্যাচারের একটা সীমা আছে। মা জলপটি লাগাচ্ছেন, ঠাকুরের কাছে মানত করছেন। জ্বর আমার নয়, জ্বর যেন তাঁর। তিনিই সর্বাধিক অপরাধী।

—সুতরাং!

—আজ্ঞে সুতরাং।

—না হে ত-এর তলায় একটি বফলা ফিট কর সুত্বরাং। ভালয় ভালয় ফিরিয়ে নাও, গ্যারেজ করে দাও। জর্জ সন্টিয়ানা কী বলছেন শুনবে, There is no cure for birth and death save to enjoy the interval. এই মাঝখানটায় একটু ঘসটাস খাওয়া। ব্যা ব্যা, ম্যা ম্যা করা।

—তা হলে সারা জীবন কী বলতে চেয়েছিলেন।

—তখন বলতে চেয়েছিলুম, সোনার হরিণের পেছনে ছোট। মানুষ হওয়া মানে রোজগার করা, অর্থ, বিত্ত, যশ, খ্যাতি। তখন বুঝিনি, সোনার হরিণ মানে সীতাহরণ পালা। নিজের কোমল অর্ধাঙ্গ কেটে না ফেললে সোনার হরিণ ধরা যায় না। জীবনের শেষ চ্যাপ্টারে এসে তোমাকে দুটি কথা বলছি, ঠাকুর দিয়ে গেছেন, নিশ্বসে :

Success has always been the worst of liars.

দ্বিতীয়টি বলেছেন বিখ্যাত হার্বার্ট ব্যায়ার্ড :

I cannot give you the formula for success, but I can give you the formula for failure—which is: Try to please everybody.

আমরা সেকালে এই শেষেরটারই শেখাতে গিয়ে, তোমাদের সর্বনাশ করেছি।

—এখন তাহলে শেষ কথাটি কী! দু'জনেই তো ভাঁটায় ভাসছি।

—শেষ হল, কার্ল জঙ্-এর কথা :

As far as we candiscern, the sole purpose of human existence is to Kindle a light in the darkness of mere being.

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের কথা, তোমাদের চৈতন্য হোক। চৌকিদারের হাতে আলো, তার মুখ দেখা যায় না, যদি না সে ঘুরিয়ে আলোটা নিজের মুখে ফেলে। নিজের আলো নিজের মুখে ফেলে নিজের মুখ দেখ চৈতন্যের দর্পণে। কী দেখবে!

—জানি না। আপনি দেখেছেন?

—নাঃ। তবে মনে হয় ঈশ্বরকেই দেখব। We are all serving a life-sentence in the dungeon of self. কৃষ্ণ বসে আছেন কংসের কারাগারে। জীবনের কুরুক্ষেত্রে বীরের সারথি হবেন। মরবেন অজ্ঞানীর ক্ষুদ্র মুষলে।

—ছেলেকে তাহলে কী হতে বলব, মানুষ?

—না। মানুষের কোনো সংজ্ঞা নেই। বরং তাকে বোলো :

> Everybody has his own theater,
> in wich he is manager, actor,
> prompter, playwright,
> sceneshifter, boxkeeper,
> doorkeeper, all in one, and
> audience into the bargain.

ইয়ে

আমি একটা মানুষ! আমার কোনও ইয়ে আছে? এই 'ইয়ে' শব্দটার কোনও তুলনা নেই। "ইয়ে" টা যে 'কিয়ে" তা ব্যাখ্যা করা যায় না। ভেতরে অনেক, না বলা বাণী ঢুকে আছে। আমার কোনও 'ইয়ে' নেই। আমাতে আর মৃগাঙ্কতে অনেক তফাৎ। আমাতে আর অভিজিতে অনেক তফাৎ। মৃগাঙ্ক, অভিজিৎ, গজেন আলাদা আলাদা নাম হলেও একই ধরনের মানুষকে বোঝাচ্ছে। সফল মানুষ। জীবনে সফল। জীবিকায় সফল। কুচকার মতো তেঁতুল জলে টুইটুম্বুর হয়ে ভাসছে।

রোজ সন্ধেবেলা আমিও বাড়ি ফিরি। মৃগাঙ্ক কি গজেনও বাড়ি ফেরে। কত পার্থক্য। আকাশ-পাতাল ব্যবধান। মৃগাঙ্কর গাড়ি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। সিলভার গ্রে-রঙের দোতলা বাড়ি। চারপাশে বাগান। বারান্দায় আইভি-লতা, যূই। গেটের মাথায় লোহার অর্ধ-চন্দ্র। আর তার ওপর বোগেন ভ্যালিয়ার আসর। যেন সানাই বাজাতে বসেছে, আলি আহমেদ খান। সামনে বাগানে নানা রঙের গোলাপ, হাসনুহানা। যত রাত বাড়ে, ততই গন্ধ বাড়তে থাকে। মৃগাঙ্কের লিপস্টিক-লাল গাড়ি বাড়িতে থামা মাত্রই চারজন ছুটে আসে, মৃগাঙ্কের মা, মৃগাঙ্কের বউ, মৃগাঙ্কের চাকর, মৃগাঙ্কের খেড়ে 'এলসেশিয়ান'; ড্রাইভার দরজা খোলা মাত্রই পা বেরিয়ে আসবে, ঝকঝকে জুতো, কুচকুচে কালো মোজা, ধবধবে সাদা ডান পাকে অনুসরণ করবে বাঁ পা, মৃগাঙ্ক নামক বিশেষ্যটি স্প্রিং-এর মতো নেমে আসবে। বেলুন আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে গেলে যে রকম হাল্কা নাচে, মৃগাঙ্ক ঠিক সেইরকম অল্প একটু নেচে নেবে। পরিধানে রুপটানা স্যুট। বুকের ওপর টাই। চোখে বিলিতি ফ্রেমের-চশমার অভিমানী কাঁচ। 'পোলারাইজড' গ্লাসের বাংলা অনুবাদ। কাঁচে রোদ লাগালে অভিমানে কালো হয়ে ওঠে।

মৃগাঙ্ক যখন স্প্রিং-এর মতো নাচছে তখন ড্রাইভার আর ছোকরা চাকর দু-জন মিলে গাড়ির পেছন হাতড়ে মালমশলা নামাতে ব্যস্ত। প্রচুর প্রচুর মশলা নামে। রোজই নামে। প্রথমে একটা বাস্কেট। বেতের তৈরি সুদৃশ্য একটি ব্যাপার। মনে হয় ত্রিপুরা থেকে স্পেশ্যাল-আমদানি। সাধারণ মানুষের হাতে অমন বস্তু সহসা দেখা যায় না। লন্ডন থেকেও আসতে পারে। কারণ মৃগাঙ্কর সবই ফরেন। দিশি মালে অসম্ভব ঘৃণা। পারলে দিশি দেহটাকেও বিলিতি করে ফেলত। উপায়

নেই। সে করতে হলে মরতে হবে। মরে টেমসের ধারে পিটার বা রবিনসনের ঘরে জন্মাতে হবে। আবার সব ধারাপাতে, প্রথম ভাগ দিয়ে জীবন শুরু করতে হবে। বাস্কেটে কী থাকে আমি জানি। থাকে লাঞ্চ বক্স, এক বোতল বিশুদ্ধ জল। গরম করে, ঢাল ওপর করে হাওয়া খাইয়ে ক্লোরিন দিয়ে বোতল ভরা। এ দেশে জল নিয়ে কোন ইয়ার্কি চলে না। জল এ-দেশে জীবন নয়, মরণ। পাট করা একটা নরম তোয়ালে থাকে। থাকে সিজনাল ফ্রুটস, দু-একটা ওষুধ। কথায় বলে, 'প্রিভেনশান, ইজ বেটার দ্যান কিওর।' দামী শরীর। কত কিছুর আক্রমণ থেকে সামলে রাখতে হয়! একজিকিউটিভ ব্যামো কী একটা! হার্টে জমাট রক্ত ধাক্কা মারতে পারে। লিভারে কি লাংসে ক্যানসার ঢুকতে পারে মৃগাঙ্ক আসে যখন এতটা দামি ছিল না, তখন খুব সিগারেট খেত। এখন ভীষণ টেনসানের সময় একটা কি দুটো তাও দামী বিলিতি।

বাস্কেটের পর নামবে ব্রিফকেস। নামবে একটা সুদৃশ্য ফ্লাস্ক। সারা দিনের মত কয়েক গ্যালন দুধ ছাড়া, চিনি ছাড়া, কালো কফি থাকে। আর নামে পার্ক স্ট্রিটের দামী দোকানের কেক আর প্যাস্ট্রির বাক্স। এ এক এলাহি ব্যাপার। রোজ সকালে লোডিং, রোজ বিকেলে আনলোডিং। শরীরের রক্ত সঞ্চালনকে একটা লেভেলে এনে মৃগাঙ্ক প্রথমেই যা করবে তা হল ওই বাঘের মত কুকুরটার সঙ্গে একটু আদিখ্যেতা। কুকুরের সায়েবি নাম রেখেছে, রাখুক আমরা কিছু বলার নেই। এলসেশিয়ান। তার নাম ভোলো, কি গজা রাখলে মানাত না। মৃগাঙ্ক কুকুরের মাথা চাপড়াবে আর বলবে, ডিক, আমার ডিক, তোমার সব ঠিক?

ডিক, আধ হাত জিভ বের করে হ্যাঃ হ্যাঃ করবে।

মৃগাঙ্ক আদুরে গলায় বলবে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ বন্দো গলম, গলম"। তারপর আকাশের দিকে মুখ তুলে বলবে, "ওঃ, হেয়াট এ সালটি ওয়েদার। অফুল।"

কুকুর ছেড়ে মৃগাঙ্ক সামনে এগোতে থাকবে আর তার বুকের কাছে টাইয়ের নট খুলতে খুলতে পেছতে থাকবে মৃগাঙ্কর মেয়ে। মৃগাঙ্কর সময় খুব কম। বাড়িতে ঢুকে টাইয়ে ফাঁস খোলার সময়টুকুও সে দিতে চায় না। বাপির যে সময়ের অভাব মৃগাঙ্কর মেয়ে তা জানে। মেয়ে কেন বাড়ির সবাই জানে। মৃগাঙ্ক কথায় কথায় বলে "সিগটেম", "প্ল্যান", "ইউটিলাইজেশান"।

বাড়িতে ঢোকা মাত্রই মৃগাঙ্কর বউ একটা হাঙ্গার-হাতে পাশে এসে দাঁড়াবে। মৃগাঙ্ক হাত দুটো পেছনে ছেতরে দেবে। সঙ্গে সঙ্গে তার ছোকড়া চাকর কোটটা সুরুৎ করে খুলে নিয়ে মেম সাহেবের হাতে দিয়ে দেবে। মৃগাঙ্ক চেয়ারে বসবে। নিমেষে খুলে ফেলবে জুতো, মোজা।

মৃগাঙ্কর মেয়ে বিলিতি স্টীরিও সিসটেমে সেতার চড়াবে। মৃগাঙ্ক বলে, মিউজিকের একটা সুদিং এফেক্ট আছে। সেতার শুনতে শুনতে জামা আর ট্রাউজার খোলা হয়ে যাবে। হাতে এসে যাবে নরম তোয়ালে। মৃগাঙ্ক ধীর পায়ে এগিয়ে যাবে বাথরুমের দিকে। ফাইবস্টার বাথরুম। এই সময় লোডশেডিং হতে পারে। হলেও ক্ষতি নেই। নিজস্ব জেনারেটার আছে। ফাট্ ফাট্ চলবে। ফটাফট আলো জ্বলে উঠবে। বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে মৃগাঙ্কর মুখ আয়নায় হেসে উঠবে। ছোট্ট দয়ে মুখ ভ্যাংচাবে নিজেকে। মৃগাঙ্ক পড়েছে, মনটাকে শিশুর মত করে রাখতে পারলে শরীর ফিট থাকে। যৌবন আটকে থাকে। স্মৃতি ভোঁতা হয় না। মৃগাঙ্ক কোমর দুলিয়ে খানিক নেচে নেয়। নিজের সঙ্গে আবোল তাবোল কথা বলে। শিশুর মতো বলতে থাকে, বিশ্বকর্মা পুজোয় মাঞ্জা দিয়ে ঘুড়ি ওড়াবো। ঘুড়ি কিনব, একতে, আদ্দে। কাল সকালে পড়া হয়ে গেলে গুলি খেলব। খোকন আমায় সঙ্গে পারবে?

খোকন ছিল মৃগাঙ্কের বাল্য-বন্ধু। এখন কোথায় আছে, কে জানে!

মৃগাঙ্ক বলবে, বড়দি, দুটো টাকা দিলে, দু-টাকারই লেবু লজেন্স কিনবো। যত সব ছেলেবেলার পরিকল্পনার কথা বলতে থাকে একে একে। বলতে বলতে একেবারে শিশুর মতো হয়ে যাবে। ঘুরে ঘুরে বারকতক নাচবে। তারপর বাথটাবের কলদুটো খুলে দেবে। তখন সে গম্ভীর। গরম জলের ট্যাপ দুপ্যাঁচ মেরে ঠাণ্ডা জলেরটায় মারবে ছ-প্যাঁচ, তবেই সে "টেপিড ওয়ার্ম" জল পাবে। বাথটা ভরে, গেলে জলে এক খাবলা নুন ফেলে দেবে। এই নুন তাঁকে গেঁটে বাত থেকে বাঁচাবে।

নুনটা গলতে মৃগাঙ্ক জোরে জোরে দম নিতে নিতে 'চেষ্ট-টা' এক্সপানসান করবে। তারপর দেহটাকে সমর্পণ করবে বাথটবের জলে। ডান হাতের নাগালের মধ্যে দেওয়ালদানিতে বিলিতি সাবানের দুধ সাধা কেক। মৃগাঙ্ক জল নিয়ে ভুঁড়িতে থ্যামাক থ্যামাক করবে। ছোট ছেলের মতো নানা রকম শব্দ করতে থাকবে মুখে তখন সে আর শিশু নয়। একেবারে সদ্যোজাত। ওঁয়া ওঁয়া করলেই হয়।

এই সময়টাকে মৃগাঙ্ক বলে, "মোমেন্টস অফ পিস অ্যান্ড হ্যাপিনেস"।

এইবার আমার কথায় আসি। আমি আর মৃগাঙ্ক সমবয়সী। কপাল গুনে মৃগাঙ্ক গোপাল, আর আমি কপাল দোষে গরু। আমার গাড়ি নেই। আমার বাহন মিনি। আমি মিনিতে থারের আসনে আধখোলা হয়ে বসব। দেখতে দেখতে ক্ষুদে যানের কুঁচকি, কণ্ঠা ঠেসে যাবে যাত্রীতে। আমাকে ভুঁড়ি দিয়ে হাঁটু দিয়ে

চেপে ধরবে। ব্রহ্মতালুতে কনুই মারবে। মেয়েরা মাথার ওপর ভ্যানিটি ব্যাগ রাখবে। মাঝে মাঝে আঁচলে মুখে ঢেকে যাবে। একবার এক ভদ্রলোক আমার মাথায় নস্যির ডিবে রেখে নস্যি নিয়েছিলেন।

আমি ওই রকম আড়ক্যাত হয়ে ঘণ্টাখানেক থাকবো; জ্যাম থাকলে দেড়, দুঘণ্টা। তারপর ধুপুস করে স্টপেজে নামব। কণ্ডাক্টার মাথায় চাটি মেরে টিকিট দেখতে চাইবে। আমার আকৃতিটাই এই রকম যে যেই দেখে সেই ভাবে, ব্যাটা একটা ছিঁচকে চোর। মেরে পালানোর পার্টি। চেহারায় কোনও আভিজাত্য নেই। বড় দোকান থেকে জিনিস কিনে বেরোবার সময় দরজার ধারে টুলে বসে থাকা দারোয়ান বিশ্রী গলায় বলবেই, বলবে, "ক্যাসমেমো"। এহেন প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা আমি কোনও দিন ভুলবো না। একদিন গ্র্যান্ড হোটেলের তলা দিয়ে লিন্ডসের দিকে হেঁটে চলেছি। আমার সামনে হাঁটছেন, লম্বা চওড়া স্যুটেড-বুটেড এক ভদ্রলোক। তাঁর ঠোঁটে বাঁকা করে ধরা একটি পাইপ। পাইপ থেকে ফিকে ধোঁয়া উঠছে। তিনি চলেছেন, আমি চলেছি। তিনি গ্যাট ম্যাট করে, আমি খুড়ুস খুড়ুস, যেন ঘোড়ার পেছনে গাধা। লিন্ডসেতে পড়ে তিনি বাঁয়ে বেঁকলেন, আমিও। তারপর আবিষ্কার করলাম দুজনেরই গন্তব্যস্থল এক। একই দোকানে। দোকানের কাঁচের দরজার সামনে দাঁড়াতেই দ্বাররক্ষক টুল থেকে তড়াক করে উঠল, সেলাম বাজাল, দরজা টেনে ধরল, পাইপ ঢুকে গেলেন, আর আমি যেই ঢুকতে গেলুম, দরজাটা সে ছেড়ে দিল, খাঁই করে আমার নাকের ওপরে। আমার শরীরের একমাত্র শোভা আমার পিচবোর্ড কাট নাকটি। আমার লম্বাটে মুখের ওপর খাড়া হয়ে আছে। যেন ওটা আমার নাক নয় প্রক্ষিপ্ত। মহাভারতের গীতা যেমন প্রক্ষিপ্ত। ও নাক এ মুখের নয়। অন্য কোন মুখের। অনেকটা নাকু মামার মতো। আমার স্ত্রী যখন আমাকে ন্যাকা বলে, তখন মনে হয় এই নাক দেখেই বলে। আমারও কিছু কিছু শুভার্থী বন্ধু আছেন, সবাই আমার শত্রু নয়। সেইরকম এক বন্ধু বলেছিলেন, "তোমার গাল দুটো ডেবে যাওয়ায় নাকের স্ট্রাকচারটা অত ঠেলে উঠেছে। গালদুটো সামহাউ একটু ভরাট করার চেষ্টা কর, অহলে তোমার ওই মুখ যা দাঁড়াবে না? জেম অফ এ পীস। ফরাসী প্রিসিডেন্ট দ্য গলের মত হয়ে যাবে।

তারপরে আবিষ্কার করলাম, গাল ভরাট করা পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিনতম কাজ। অনেকটা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার মতো। পুকুর ভরাট করা যায়, চোয়াড়ে গাল ভরাট করা যায় না। ধার করে, দেনা করে ফ্যাট খেয়ে, প্রোটিন খেয়ে, ভুরিটাই বেড়ে গেল। খাবলা গাল খাবলা গালই থেকে গেল।

দোকানের দরজাটা খাঁই করে নাকে লাগতেই সর্দি হয়ে গেল। আমি তো আর মুষ্টি যোদ্ধা নই। নাকে ঘুষি হজম করার শক্তি কোথায়? দ্বাররক্ষকের ওপর রাগ হল। তার বয়েই গেল। আমার মত ফেক্কলুকে সে পাত্তা দেবে কেন? ঠাণ্ডা, সুন্দর দোকানের ভেতর সমাদৃত সেই পাইপ। ঘুরে ঘুরে শাড়ি দেখছেন, কার্পেট দেখছেন, বিছানার চাদর দেখেছেন। কী আগ্রহ নিয়ে দোকান-বালিকারা তাঁকে দেখাচ্ছেন। তিনি মাঝে মাঝে পাইপ-চ্যুত হয়ে অল্প স্বল্প মন্তব্য করছেন। আমাকে কেউ পাত্তাই দিচ্ছে না। বলছি, চাদর, বলছে ওই তো চাদর দেখুন না। বলছি শাড়ি, বলছে এখানে শাড়ির অনেক দাম। পাইপ সারা দোকান ওলটপালট করে দিয়ে, শুধু হাতে প্রস্থান, করলেন। মাঝে মাঝেই তাঁকে বলতে শুনলুম, দ্যাট মাই চয়েস্, দ্যাটিস নট ফাইন, বেটার সামথিং। ভেবেছিলুম বড় খদ্দের যাবার পর ছোটটার দিকে নজর পড়বে। কোথায় কী! সুন্দরীরা নিজেদের মধ্যে গল্প শুরু করলেন। আমি তাঁদের সামনে কাউন্টারের উল্টোদিকে গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলুম। মোটা সুন্দরী, ছিপছিপে সুন্দরী, রোগা ভুরুওলা সুন্দরী, ভুরু আঁকা সুন্দরী, খোঁপা সুন্দরী, এলো সুন্দরী। কত কী যে তাঁদের বলার আছে। মাধুরীদি। স্বপ্নাকে কী বলেছে? স্যান্যালদাটা ভীষণ অসভ্য! ওরই মধ্যে একজন বলে ফেললে,...লাগে, একদিন ঝাড় খাবে। আমার রুচিশীল কান বললে, পালাও। পলাব মানে! সোজা ম্যানেজার। তিনি ছুটে এলেন "তোমরা ভদ্রলোককে শাড়ি দেখাচ্ছ না কেন?" স্লিম সুন্দরী আমার দিকে তাকিয়ে চোখ মটকে বললে, "আহা, বোবা না কি? না বললে দেখাব কি?"

আমার প্রায় প্রেমে পড়ে যাবার মতো অবস্থা। ভবা পাগলের নাম শুনেছ, আমি এক প্রেম পাগলা, এই করেই আমার বউয়ের প্রেমে পড়ে জীবনটা নষ্ট করেছি। মৃগাঙ্ক হতে হতেও হওয়া হল না। সংসারের ম্যাঁও সামলাতে সামলাতেই ঘাটে যাবার সময় হয়ে গেল। প্রবীণা এক মহিলা বললেন, সীমা, ভদ্রলোককে ওই ওপরের থাকের শাড়িগুলো দেখাও।' চালাকিটা পরে বুঝলুম। আমাকে অপদস্থ করার জন্যে সবচেয়ে দামী শাড়ি একের পর এক নেমে এল। সাড়ে চারশো, সাতশো, সাড়ে নশো।

আমি বললুম, 'আর একটু কম দাম?' 'এ দোকানে কম দামের শাড়ি রাখা হয় না। আমি সেই ক্ষয়া চাঁদের চোখের বাণে কাবু হলে কী হবে, তিনি আমার খাড়া নাকের আভিজাত্যকে মোটেই সমীহ করলেন না। আমি প্রায় মরিয়া হয়েই, সাড়ে চারশো দামের একটা শাড়ি কিনে ফেললুম। তখনও আর একজনের

ওপর বদলা নেওয়া বাকি ছিল। ওই সেই দ্বাররক্ষক। শাড়ির প্যাকেট বগলে নিয়ে আমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। আমি আগেই দেখে রেখেছিলুম, সে পাইপকে উঠে দাঁড়িয়ে, দরজা খুলে সেলাম করেছিল।

বললুম, 'গেটআপ।'

লোকটি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। ধমকের সুরে বললুম, 'গেট আপ।'

তখন আমার সংহার মূর্তি। উর্দি উঠে দাঁড়াল।

'দরওজা খোল।'

দরজা খুলে ধরল। তখনও তার আর একটা কাজ বাকি।

'স্যালুট। সেলাম বাজাও।'

সেলাম করল। আমি সেই পাইপ দাদার মতো গ্যাটম্যাট করে বেরিয়ে এলুম। লোকটা মহা শয়তান। আমার শরীরটা পুরো বেরোবার আগে, দরজাটা ছেড়ে দিল। কড়া স্প্রিং। দুম করে দরজাটা আমার পায়ের গোড়ালিতে ধাক্কা মারল। মারুক। আমি আমার পাওনা আদায় করে নিয়েছি।

এই এত বড় একটা ভনিতার কারণ, আমার দুঃখ। লোকটাকে কেউ সামান্যতম পাত্তা দেয় না। বাড়ির লোক, না বাইরের লোক। কেন? কারণটা কী? এক জ্যোতিষীকে বলেছিলুম, 'একবার দেখুন তো মশাই, হরোসকোপটা। কোথায় কোন গ্রহ এঁকে বেঁকে আছে।

অনেক অঙ্কটঙ্ক কষে তিনি বললেন, "আপনার রবিটা খুব ড্যামেজ হয়ে আছে, যে কারণে চামচিকিতেও আপনাকে লাথি মারবে। মটরদানার মতো একটা হীরে পরুন।" হীরে পরব আমি। আমি কি মৃগাঙ্ক? দশ, বারো, চৌদ্দ, কত হাজার পড়বে কে জানে, মারুক চামচিকিতে লাথি। যাক, যে কথা বলছিলুম, মিনি থেকে নেমে আমাকে এ-দোকান, সে দোকান ঘুরে ঘুরে জিনিস কিনতে হবে। কেরোসিন কুকারের পলতে, চিঁড়ে, ছোলা, বাতাসা, বাদাম, মাথাধরার ওষুধ, সেজের চিমনি, মুরগীর ডিম, পুজোর ফুল। কেনাকাটার কোনও মাথামুণ্ডু নেই। নিতান্তই মধ্যবিত্তের জিনিস। মৃগাঙ্কর প্যাটিস-প্যাসট্রি নয়। আর সবই বিপরীতধর্মী জিনিস আনতে হয় ফুলের সঙ্গে ডিম ঠেকাবে না। বাতাসায় চাপ পড়বে না। চিমনি চাপ সইবে না। এ সবই আমার প্রেমের বউয়ের কারসাজি। রোজই এমন সব জিনিস আনতে বলবে, মানুষের দু হাতে, ম্যানেজ করা অসম্ভব। দশটা হাত, দশটা মুণ্ড হলে যদি কিছু করা যায়। এ সংসারে রাম হলে কপালে বনবাস। রাবণ হতে হবে। রাজ্যপাট, লোভনীয় পরস্ত্রী, সবই তখন সম্ভব। রাম হলে ভোগান্তি। রাবণ হলে ভোগের চূড়ান্ত। দু

হাতে বুকের কাছে সব পাকড়ে ধরে বাড়ি মুখো হাঁটতে হাঁটতে বলি, "আই অ্যাম এ ডিগনিফায়েড ডঙ্কি।" ফাইনাল খেলা সুরু হয় বাড়ির সামনে এসে। রবি নীচস্থ হলেও মঙ্গল আজ মনে হয় তুঙ্গী। বরাতে বাড়ি মোটামুটি ভালই জুটেছে। সামনে একটু বাগান মতো আছে। গেট। গেট থেকে সিমেন্ট বাঁধানো রাস্তা সোজা সদরে। আমার বউয়ের এদিক নেই ওদিক আছে। নিজে পায় না খেতে শঙ্করাকে ডাকে। লোমঅলা ফুটফুটে কুকুর কিনে এনেছে। তিনি যে গৃহ-দেবতা। তাঁর সেবার শেষ নেই। তিনি সকালে চুকচুক করে আধবাটি দুধ খাবেন। নিজে খাই, না খাই, ডেলি একশো গ্রাম ক্রিম ক্র্যাকার—বাঁধা। ঝড় হোক, রাষ্ট্রবিপ্লব হোক, এমনকি অ্যাটম বোমা পড়লেও ডেলি দুশোগ্রাম কিমা। মাসে ডাক্তার, বদ্যি, ওষুধবিষুধের পেছনে অ্যাভারেজ পঞ্চাশটাকা। নিজে অসুস্থ হলে পড়ে থাকা যায়। কেউ গ্রাহ্যই করবে না। তুমি ব্যাটা মরে ভূত হয়ে যাও, কিছু যায় আসে না। ঘটা করে শ্রাদ্ধ করে, পাস বই নিয়ে ব্যাঙ্কে ছুটবে। অ্যাকাউন্ট ট্রান্সফার করবার জন্যে। তুমি তো আমার লোমঅলা বিলিতি কুকুর নও। হিন্দি ছায়াছবিতে যেমন গেষ্ট আর্টিষ্ট থাকে, আমাদের সেইরকম গেষ্ট কুকুর আছে সে আবার আর এক ইতিহাস। কে বলে ইতিহাসে কেবল রাজারাজড়া? সাধারণ মানুষের জীবনে কম ইতিহাস? বছর দশেক আগে এক বর্ষার রাতে রাস্তার লালু এসেছিল বারান্দায় আশ্রয় নিতে। সেই লালু হয়ে গেল গেষ্ট। লালুর চারটে বাচ্চা হল। কাল্লু আর গুগলু বড় হল। তাদের হল চারটে চারটে আটটা। তিনটে গেল রইল রইল পাঁচটা। সে এক জটিল হিসেব। তবে এখন যা অবস্থা পিলপিল করছে কুকুরে। রাতে কানে তুলো গুঁজে, দরজা জানালা বন্ধ করে শুতে হয়। মিনিটে মিনিটে ডাক। প্রথমে একটা ডাক, তারপর আর কটা কোরাসে। শুরু হলে আর থামতে চায় না, সভাপতির ভাষণের মতো। আমার বউ বলবে, "কি আশ্চর্য। কুকুর ডাকবে না। ডাকবে বলেই তো দেড় কেজি চালের ভাত খাওয়াই।'

বাঙালির বাত, কুকুরের ডাক।' বেশ বাবা? তাই হোক। তা কিন্তু হল না। মালকিন নিজেই এবার কুকুরের ওপর খাপ্পা। কুকুরেরা খেলা করে। খেলার আনন্দে তারে ঝোলা শাড়ি ছিঁড়ে ফালা ফালা করেছে। দরজার পাপোশ আঁচড়ে র-মেটেরিয়াল করে দিয়েছে। এই সব অপকর্ম যদিও বা সহ্য হল, হল না সেই মারাত্মক অপরাধ। গেষ্ট আর্টিষ্টরা একদিন বাড়ির লোমঅলা হিরোকে বাগে পেয়ে খাবলে দিল। এমন নিয়ম হয়েছে, যে-ই আসুক আর যে-ই যাক গেট বন্ধ করতে হবে। সেও আবার এক ইতিহাস। লোয়েষ্ট কোটেসানের লোহার গেট।

লোহা নামে সরু কতগুলো সিক সরু পার্টির ফ্রেমে ঢালাই করা। বাতাসে ম্যালেরিয়া রুগির মতো কাঁপে।

ফুঁ দিলে খুলে যায়। ফলে ব্যবস্থা যা হয়েছে, তা অভিনব। অষ্টগণ্ডা গিঁটঅলা, একটা দড়ি দিয়ে গেটটা বাঁধা হয়। বাঁধা সহজ। যে বাঁধে, সে বাঁধে। শ্যামল মিত্রের সেই গান, 'ফুলের বনে মধু নিতে অনেক কাঁটার মালা, যে জানে সে জানে, ভ্রমরা যায় না সেখানে। খুলতে পিতার নাম ভুলিয়ে দেয়। গেঁটে বাতের মতো।

মৃগাঙ্ক যখন ফেরে তাকে স্লিসিভ করার জন্যে একটা ব্যাটেলিয়ান খাড়া থাকে গার্ড অফ অনার দেবার জন্যে। আমি তো আর মৃগাঙ্ক নই।

ছেলেবেলায় একটা ছবি দেখেছিলুম কোনও এক বইয়ে, দ্রোপদীর বস্ত্রহরণ। বুকের কাছে দুহাত দিয়ে দলা পাকানো কাপড় ধরে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, আর রাজার পোশাক-পরা গুঁপো একটা গুণ্ডা, হয় দুঃশাসন না হয় দুর্যোধন আঁচল ধরে টানছে। আমাদের বাড়ির গেটের সামনে আমারও সেই অবস্থা। বুকের কাছে দু-হাতে জাপটে ধরা প্যাকেট-ম্যাকেট। কাঁধে সাইড ব্যাগ, সামনে গেঁটে বাত। গেটে দড়ি বাঁধা ম্যালেরিয়া গেট। আবার একটা গানের কলি, কেউ দেওনি তে উলু, কেউ বাজায়নি শাঁক। দু-হাতে যে বাঁধন খোলা যায় না, সেই বাঁধন খুলবে। এক হাতে? আলিবাবা, চিচিংফাঁক মন্ত্র দাও। বলে না, ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়। কে বলে বাঙালির ফেলো ফিলিংস নেই। খুব আছে। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে কেউ না কেউ আমার সাহায্যে এগিয়ে আসে? আমি ভাবি কত ভাবেই না মানুষ রোজগার করতে পারে। আমার ফেরার সময় খোকন জেগে গেছে। সেও এক ইতিহাস। খোকন খাঁড়ার বাবার ছিল সাবেক কালের বিশাল গোলদারী দোকান। প্রভূত পয়সার মালিক। পয়সা হল ভূত। ভূতে ধরলে মানুষের মতিভ্রম হয়। বড় খাঁড়া পর পর তিনটে বিয়ে করে ফেললেন। লোকে একটা বউয়ের হ্যাপা সামলাতেই হিমসিম খেয়ে যায়। সব হ্যাপিনেস, গাং গঙ্গায়ৈ নমঃ। বড় খাঁড়ার চুল উঠে গেল। মুখ ফুলে গেল। ভুঁড়ি বেড়ে গেল। আমরা ভাবতুম সুখে বড় খাঁড়া মোটা হচ্ছে। তা নয় খাঁড়ার উদুরি হয়ে গেল। খাঁড়া মরে গেল। লোকে মরলে একটা বউ বিধবা হয়। খাঁড়া তিন তিনটেকে বিধবা করে পগার পার। তারপর যা হয়, বিষয় বিষ। মামলা, মকদ্দমা, মারদাঙ্গা। গোলদারী ভুস। বড়পক্ষের ছেলে খোকন খাঁড়া। খাঁড়া হলে কী হবে ধার নেই। পথে পড়ে গেল। কল্কে ধরলে। অন্যের কল্কে ধরলে লোকের আখের ফেরে। নিজে কল্কে ধরলে সর্বনাশ হয়। খোকন এখন আধপাগলা। শুধু

ধান্দা, কীভাবে গাঁজার পয়সা জোগাড় করা যায়। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়।

সে আবার কী কথা। বলি সে কথা। ভগবান আমার জন্ম দিলেন। বয়েসকালে বাবরি চুল রেখে প্রেম করলুম। হ্যাঁ হ্যাঁ করে বিয়ে করলুম। ধারদেনা করে বাড়ি করলুম। পয়সার অভাবে লগবগে গেট করলুম। বিজ্ঞান হাতে তুলে দিল টিভি। প্রবাদ, যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে রামশর্মা। যত প্রেম তত ঘৃণা। আমার; বউ টিভি দেখবে। আমি গরু খেটে ফিরব। দু-হাতে ফলটা মুলোটা। খোকন খাঁড়া সামনের বাড়ির রকে। সে নেমে আসবে মেসোমশাইকে সাহায্য করতে। বিনিময়ে পঁচিশ পয়সা। এক পুরিয়া গঞ্জিকার দাম।

একেই বলে কুকুর। আমার বউ আমার এই বেড়া টপকানোর খবর কিছুই জানতে পারবে না। পারবে লোমওলা কুকুর। সে ঘেউ ঘেউ করবে। তাতেও আমার বউ উঠবে না। ভাগ্যিস ছেলেবেলায় ব্যাতে ফুটবল খেলেছিলুম। ডানপায়ে সদর দরজায় দমাদম লাথি। তখন দরজা খুলে যাবে। কুকুর ছুটে আসবে। দু-হাত তুলে নাচবে। চাটার চেষ্টা করবে। আর আমার বউ হাসিমুখে অভ্যর্থনার বদলে, কি জিনিসপত্তর ধরে আমাকে খালাস করার বদলে একটি কথাই রুক্ষ গলায় বলবে, 'গেটে দড়ি বেঁধেছ? যাও বেঁধে এস।'

মালপত্তর কোনরকমে নামিয়ে, আমি গান গাইব। মনে মনে। বাঁধ না তরীখানি আমার এই নদীকূলে। একা দাঁড়িয়ে আছি লহ না কোলে তুলে। তারপর ছুটবো তলতা গেটে বাঁধতে। ওই কাজটি করার কালে আমি দার্শনিক হয়ে যাব। মাথার ওপর মরুর আকাশ। মিটিমিটি তারা। আমার বাগানের কৃষ্ণচূড়ার ঝিরিঝিরি পাতা। অসংখ্য গাঁটওলা একটা দড়ি, যেন হাতে ধরা জপের মালা। একটা গাঁট এক একটা রুদ্রাক্ষ। আমি তখন সত্যি সত্যিই তিন গাঁটে ওঁকার জপ করব। পা বাড়ালেই পথ। আমি তখন গাইব প্রশ্নের মতো করে, 'কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়?'' আমি কোনও উত্তর খুঁজে পাব না। মাথা নিচু করে ফিরে আসব। আমার কুকুর গাল চাটবে,। মৃগাঙ্কয়া বিলিতি আফটার শেভ লোশান-আছে। সেটা থাকে শিশিতে আমারও রয়েছে একটু অন্যভাবে। বিলিতি কুকুরের জিভে। ভাবামাত্রই আমার মন মসৃণ। মধ্যবিত্ত মলিন বাথরুমে ঢুকে কল ছাড়ব, আর ছাড়ব আমার গল-হারে রে রে রে তোরা দেরে আমায় ছেড়ে।

ফল্গু

রাতের খাওয়াদাওয়া শেষ করে বিছানায় আড় হয়ে কি একটা বই নাড়াচাড়া করছি। আজকাল এইরকমই হয়েছে। কি খাচ্ছি, কি পড়ছি কিছুই আর তেমন খেয়াল থাকে না। খেয়াল করিও না। কিছুটা অভ্যাস, কিছুটা সংস্কার এই ভাবেই জীবন চলছে। অভ্যাসে বাজার যাই। অফিসে ছুটি। সংস্কারে বই টেনে নি। পাতা ওল্টাই। বয়েস বেড়ে গেছে। চোখের তেজ কমেছে। তেমন দেখতে পাচ্ছি না। উঠে গিয়ে চশমাটা নিয়ে আসবো, সে শক্তিও যেন নেই। রোজই ওইরকম হয়। দু'চার পাতা নাড়াচাড়া করতে না করতেই শরীর খ্যাস করে নেতিয়ে পড়ে। রোজই এই সময়টায় আমার এক সমস্যা হয়—কে মশারি খাটাবে! আমি না আমার বউ। এদিকে সাংঘাতিক মশার উপদ্রব। মশারি ছাড়া এক মুহূর্ত শোবার উপায় নেই। আর রোজ রাতেই এই মশারি পলিটিক্স হয়। বউ বলবে—'চারটে কোণ খাটিয়ে তুমি শুয়ে পড় আমার সৃষ্টি কাজ পড়ে আছে, আমার অপেক্ষায় থেকো না, গতরটা একটু নাড়াতে শেখো।' এই গতর শব্দটা শুনলেই আমার মাথায় খুন চেপে যায়। মেয়েদের জগতের বিশ্রী একটা শব্দ। অশ্লীল তো বটেই। আজ আমি অপেক্ষায় আছি। কাল, পরশু তার আগের দিন, পর পর তিনদিন আমি মশারি খাটিয়েছি। আজ আর আমি নেই। মরে গেলেও নেই। বইটার পাতা ওল্টাচ্ছি আর মনে মনে বলছি—এ লড়াই জিততে হবে। আজ আর আমি নেই। আর ঠিক সেই সময় রান্নাঘর থেকে চিৎকার 'এলিয়ে না থেকে মশারিটা ফেলে চারপাশ ভাল করে গোঁজো। জীবনে একটা কাজ অন্তত ভালো করে করতে শেখ।'

'পরপর তিন দিন আমি মশারি ফেলেছি, আজ আমি মরে গেলেও ফেলবো না?'

'তাহলে মরো, মশার কামড় খেয়েই মরো। যখন ম্যালেরিয়া হবে তখন বুঝবে ঠেলা।'

'হলে তোমার আমার একসঙ্গেই হবে, এক যাত্রার তো আর পৃথক ফল হয় না।'

'ওই আনন্দেই থাকো, মেয়েদের ম্যালেরিয়া হয় না। হলে অম্বল হয়' বাত হয়, পিত্তপাথুরী হয়। স্বামীদের কামড়ে জলাতঙ্ক হয়।'

'আচ্ছা।' আমি সুর টানলাম।

হাওয়া বইছে এলোমেলো। রাত সাড়ে এগরোটা বারোটার সময় আমি আর ঝাটা কাঁসি নিয়ে তরজা শুরু করতে চাই না। এ পাড়ায় আমার একটা সম্মান আছে। অনেকেই প্রণামটণাম করে। বাড়ির লোক ঝাঁটা মারলে কি হবে, বাইরে আমার অল্প বিস্তর খ্যাতি। একসময় ভালো ফুটবল খেলতুম, ফরোয়ার্ড লাইনে। সেকালে ফুটবলের তেমন কদর ছিল না, একালের ছেলেরা তো বল পাগল। সেই কারণেই অতীতের গোলন্দাজ হিসেবে একালে আমার খাতির। আমার পায়ে বল মানেই গোল। এই তো গত দুর্গা পূজায় পাড়ার ক্লাব আমাকে সম্বর্ধনা জানালো। একটা টিনের ট্রে, তার উপর ছোট সাইজের একটা নারকেল, ছোট বাক্সে চারটে সন্দেশ। সে যাই হোক, শ্রদ্ধা ভালবাসার কোনও মূল্য হয় না। গলায় একটা রজনীগন্ধার শুকনো মালা পরিয়ে দিয় ছোট্ট বাক্সে চারটে সন্দেশ। সে যাই হোক, শ্রদ্ধা ভালবাসার কোন মূল্য হয় না। গলায় একটা রজনীগন্ধার শুকনো, মালা পরিয়ে দিল ছোট টুলটুলে একটা মেয়ে। মালাটা আমি সঙ্গে সঙ্গে তার গলায় পরিয়ে দিয়েছিলুম। একেই বলে মহানুভবতা। লোককে দেখানো, আমি কতটা নির্লোভ, নিরহঙ্কারী। সবার আগে একটি বড় মেয়ে প্রদীপ দিয়ে আমাকে বরণ করেছিল । মেয়েটি মনে হয় আমার ব্যক্তিত্বে ভয় পেয়ে গিয়েছিল, তা না হলে আমার গোঁফে ছ্যাকা দিয়ে দেবে কেন? আমার এক গোছা ঝোলা ঝোলা গোঁফ পড়পড় করে পুড়ে গেল। সে থাক, দোষটা আমারই। একালে কেউ বড় গোঁফ রাখে না। সেই যে আমি গোঁফ কামালুম, এখন আমার ঠোঁট সাফ। বয়সটাও যেন অনেক কমে গেছে। আগে অচেনা লোক মাত্রই কিছু জিজ্ঞেস করার হলে কথা শুরু করতো হিন্দিতে। এখন বাংলাতেই করে। সভার সভাপতি মহাশয় গলায় একটা পাটকরা মাদ্রাজী চাদর পরিয়ে দিলেন। আমাকে আবার দু'চার কথা বলতে হল। আমি বলেছিলুম— ফুটবলই আমাদের জীবন। দুটো পা যেন স্বামী-স্ত্রী-জুটি; আর বল হল গোল, মানে বিশ্ব। এই বিশ্ব হল স্বামী-স্ত্রীর খেলা। ঠিক বোঝাবুঝি, মেলামেশা হল তো, খেলা হয়ে গেল কবিতা। দুটো পায়ের আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিংই হল খেলোয়াড়ের সাফল্যের মূল কথা। উঃ সে কি হাততালি। তিন মিনিটে হিরো। অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে শখানেক তরুণ তেড়ে এল। যার খাতা নেই সে এগিয়ে ধরল, ঠোঙা। মনে হয় বাদামটাদাম খাচ্ছিল। সই করতে করতে আমার জান কয়লা। ফড়াক ফড়াক ছবি তুললেন ফটোগ্রাফার। এক নেতা এসে বললেন—নেকস্ট ইলেকশানে আমরা আপনাকে পার্টির টিকিট দোবো। যদি জিততে পারেন, যদি আমরা মিনিস্ট্রি ফর্ম করতে পারি, জেনে রাখুন আপনি হবেন ক্রীড়া মন্ত্রী। আমি

সেই গ্যাস খেয়ে বাড়িতে এসে একটা উলটো-পালটা করে ফেললুম। মন্ত্রীদের মতো মেজাজ দেখাতে গিয়েছিলুম। সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়। আমার একমাত্র স্ত্রী সঙ্গে একমাস বাক্যালাপ বন্ধ ছিল। টিনের ট্রেটা দেখে বলেছিল, আজকাল এক প্যাকেট বড় সার্ফ কিনলে ওই রকম ট্রে ফিরি পাওয়া যায়। চাদরটা দেখে বলেছিল, ব্যাণ্ডেজ হিসেবে ভালই। নারকেলটা হাতে নিয়ে বলেছিল, একটা মোচা নিয়ে এলে ছোলা দিয়ে ঘণ্ট করা যাবে। সম্বর্ধনার নারকেলে কি ঘণ্ট করা উচিত। এই সংশয় আমার ছিল। এতো ভাবের নারকেল। ভালবাসার উপহার। ভালবাসার ঘণ্ট হবে! মোচার দাম কম নয়। এরপর সম্বর্ধনায় যাঁরা নারকোল দেবেন, তাঁরা যদি একটা করে মোচাও দেন তো বেশ হয়। আমার বউ আবার হিসেব করে ছেলেকে বুঝিয়ে দিলে বুড়ো বয়সে তার বাপের কী রকম ভীমরতি ধরেছে, একশো একটাকা চাঁদা কানমলে নিয়ে গিয়ে কুড়ি টাকার মাল ঠেকিয়েছে, পরের বছরের জন্যে গলায় পরিয়ে দিয়েছে ব্যাণ্ডেজ। গামছার সিম্বল। ওরে আমার বড় পেলোয়াররে। সারা রাত বাতের যন্ত্রণায় কোঁ কোঁ করে। তিন পা হেঁটে সাতবার হাপরের মতো হাঁপায়।

যাক, যারা আমার গৌরবোজ্জ্বল অতীত দেখতে পায় না, দেখলেও দেখতে চায় না, তাদের আমার কিছু বলার নেই। বাঙালি ইতিহাসে বিমুখ জাতি, আমরা সবাই জানি। এরা ইতিহাস বলতে বোঝে আকবর বাদশার ইতিহাস। সিনেমার 'ফ্ল্যাশব্যাক' দেখবে, একটা জ্যান্ত মানুষের ফ্ল্যাশব্যাক শুনবেও না, বিশ্বাসও করবে না। আমাদের যেন অতীত থাকতে নেই। আমরা সব বর্তমানের সরীসৃপ। আবার বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগলুম। এবার মলাটে চোখ পড়ল। র‍্যাক থেকে ভাল বইই টেনেছি—গীতা মাহাত্ম্য। এই বয়সে যে বইয়ের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, সংসার, সব ছিরি তো দেখছি। কতদিন ভাবি সন্ন্যাসী হয়ে কেটে পড়ব, পারি না। অন্য কিছুর জন্যে নয়, শুধু মাত্র বাথরুমের ভয়ে। গৃহত্যাগের সময় নিজের বাথরুমটাকে তো আর নিয়ে যেতে পারবো না। যত্রতত্র আমার পোষায় না। ঘেন্না করে।

দরজার কাছ থেকে আমার রাখবালের একটু চড়া গলা শোনা গেল—'কি হল মশারির চারটে কোণ দয়া করে খাটাতে পারছ না, গতরটা একটু নাড়াও। না পরের গতরে যতটা হয়ে যায়!'

আবার সেই অশ্লীল শব্দটা। উঠে বসলুম। গতর বললেই, লুঙ্গি পরা, বিশাল ভুঁড়ি আর পাছাঅলা একটা নির্বোধ গভীর চেহারা ভেসে ওঠে। বিছানায় শুয়ে যারা মিঠি মিঠি গলায় গুন গুন করে ডাকে, 'কই গো, কই গো, তোমার

হল।' বউ তেলানো পার্টি। আমি সর্ব অর্থে তার বিপরীত। জীবনে বউকে হ্যাঁ গা, কই গা, শুনছো বলিনি। সেন্টার ফরোয়ার্ডের স্ট্রেটকাট কথা। পায়ে বল নাও, দু'বার ড্রিবল করে ঢুকিয়ে দাও নেটে। আর তাকাতাকি নেই, ফিরে এসো মাঝ মাঠে। আমার গুরু আমাকে জপের মন্ত্র দিয়েছিলেন, 'অ্যাটাক, অ্যাটাক'। আমি ঝাঁজেই বললুম :

'দ্যাখো গতর গতর বলবে না। গতর হয় মেয়েদের। আমার মতো খেলোয়াড়দের হয় ফিগার। আমার একেবারে কঞ্চির মতো শরীর। মশারি আজ আমি খাটাবো না, খাটাবো না, খাটাবো না। দিস ইজ নট মাই জব।'

'খাটিয়ো না, খাটিয়ো না।'

গলা নয় তো গোলা। একেবারে সংলগ্ন বাড়ির প্রতিবেশী মশারি ফেলা অন্ধকার ঘর থেকে দাবড়ে উঠলেন, 'আয় চোপ।' ভদ্রলোক সূর্য ডোবার পর থেকেই চড়াতে থাকেন। এখন তিনি পুরো চড়ে আছেন। আমি কিছু মনে করলুম না। জানি সকালেই তিনি বিনীত গলায় বলবেন—'কি দাদা, বাজারে চললেন।' আমরা জানি, মাতালে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়।

আমার ছেলে। ওই একটি মাত্রই ছেলে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললে— 'আশ্চর্য, দিন দিন তোমাদের বয়েস বাড়ছে না কমছে।' বলেই সরে পড়ল। সবে প্রেম করে বিয়ে করেছে। মৌতাতে আছে। নতুন বউমা বিয়ের পর দিন-সাতেক মশারি খাটিয়ে পরিপাটি বিছানা করে শ্বশুর, শাশুড়ীর সেবা করেছিল। তারপর শোনা গেল স্পণ্ডিলোসিস হয়েছে। হাতের খিল জ্যাম হয়ে গেছে। ওপর দিকে আর উঠছে না। যা পারছে তলার দিক থেকে সব হাতড়ে নিচ্ছে। মানুষের কপাল মন্দ হলে যা হয়। কে কাকে সেবা করে। এখন বধূ আর পুত্রবধূ দুজনের সেবা করে প্রারব্ধ ক্ষয় করি। ছেলে তো বিয়ে করেই দায় সেরেছে। একালের ছেলেদের তো কোনও কর্তব্যবোধ নেই। প্রেম করার সময় খিদমত খাটতো তা, আমি জানি। তখন মাছ খেলছিল, এখন মাছ জালে। আর তো কোনও ভয় নেই। এখন খাও দাও আর বগল বাজাও। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুরে বেড়াও।

পাখার স্পিড বাড়িয়ে, আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লুম। প্রথমত রেগে আছি, অভিমানে একেবারে টসটসে। দ্বিতীয়ত স্ত্রী, পুত্র, পরিবারের হুল যে সহ্য করতে পারে, মশা তার কি করবে। সেই আছে না, সমুদ্রে পেতেছি শয্যা শিশিরে কি ভয়! নিদ্রাতেই মানুষের সব দুঃখের অবসান। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লুম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। রাত কত তা জানি না। ঘরে গুমোট গরম। পাখা বন্ধ। কানের কাছে ঝাঁক ঝাঁক মশার কালোয়াতি। রাস্তার আলো শোওয়ার

আগে জ্বলছে দেখেই শুয়েছি। এখন চারপাশ ঘুটঘুটে অন্ধকার। তার মানে লোডসেডিং। মেঝেতে আপাদমস্তক সাদা চাদর ঢাকা একটা লাশ পড়ে আছে। আমার পঁচিশ বছরের প্রাচীন অভিমানী বউ। যত বয়েস বাড়ছে, তত মেদ বাড়ছে, তত বাড়ছে রাগ আর অভিমান। এইটুকু বুঝলুম ইলেকট্রিক সাপ্লাই চলে বউদের নির্দেশে। তা না হলে ঠিক এইসময়ে লোডশেডিং হবে কেন? আমাকে অন্যায় রণে হারিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র। যেমন কুরুক্ষেত্রে কর্ণের রথের চাকা বসে গিয়েছিলো।

যাই হোক সামান্য একটু যা ঘুমিয়েছি তাইতেই আমার রাগ জল হয়ে গেছে। আমি খাটে, বউটা আমার মেঝেতে। মনটা গুমরে উঠল। আহা পরের মেয়ে! বাপ নেই, মা নেই। মেরেছো কলসির কানা, তা বলে কি প্রেম দেবো না। খাট থেকে অন্ধকারে ঠাহর করে নামলুম। তারপর খুঁজে খুঁজে গোলগোল হাত দুটো ধরে তোলার চেষ্টা করলুম। ও বাবা, এ যেন এক পেল্লায় বোয়াল মাছ, পিছলে যায় একবার এ-পাশ একবার ও-পাশ। আবার আমার রাগ চড়ছে। কি উঠবে না। মার টান। হেঁইয়ো, মারি হেঁইয়ো, আউর থোড়া হেঁইয়ো, বয়লট ফাটে হেঁইয়ো ঘাস বিচুলি হেঁইয়ো। হাতখানেক তুলি তো, থ্যাস করে শুয়ে পড়ে। আমার বউ যে এত ভারি জানা ছিল না। যেন জগদ্দল পাথর। বোম্বে ছবির নায়িকা হলে হিরোর ভাত মারা যেত, কারণ একটা দুটো সিন এইরকম থাকতোই যেখানে নায়ক নায়িকাকে দু'হাতে পাঁজা কোলা করে তুলে বনের ধারে পাগলের মতো ঘুরপাক খাচ্ছে আর গাইছে—মেরা পেয়ার ঝুলতা রহে, ঝুমঝুম। বোম্বে ছবির নায়করা তো সব প্রেমে আধপাগলা মতো হয়ে যায়। তা এই নায়িকাকে কে তুলবে। এক গব্বর সিং পারতে পারে। যাই হোক আমার রোক চেপে গেল—কি? স্বামী হয়ে স্ত্রীকে খাটে তুলতে পারবো না। কত ছোবড়ার ওজনদার গদি আমি তুলেছি একা। অলিম্পিকের চ্যাম্পিয়ান ওয়েট লিফ্টারদের স্মরণ করে, মারলুম আর এক টান। চাগাবার চেষ্টা করলুম। আর তখনই বুকের ডানপাশে যেন ওয়ার্ল্ড হেভি ওয়েট চ্যাম্পিয়ানের এক ঘুসি পড়ল। নিথর নিস্পন্দ হয়ে এল শরীর। পরাজিত মুষ্টিযোদ্ধা যেভাবে স্লো-মোশানে রিং-এর মধ্যে পড়ে যায় আমিও সেই ভাবে পড়ে যেতে যেতে বললুম—'যাঃ সুধা, তুমি বিধবা হলে। হার্ট-অ্যাটাক।' আর কোন বড় কথা বলার ক্ষমতা আমার নেই। উঃ হৃদয় আটকে গেলে, মানুষের কি যে হয়। কোথায় লাগে রেল রোকো, বাংলা বন্ধ। হৃদয় বন্ধের মতো কিছু নেই।

চিৎ হয়ে মেঝেতে পড়ে আছি। শরীর অবশ। দম পড়ছে, আবার বন্ধ

হচ্ছে। একটু বাতাসের জন্য মানুষের কি ছটফটানি। আমার বউ এতক্ষণ জেগে জেগে মশকরা করছিল। বিধবা শব্দটায় চাঁদমারি হল। আচ্ছন্ন চেতনা নিয়েই বুঝতে পারছি, অন্ধকারে উঠে বসেছে। প্রথম প্রথম বিধবা হতে সকলেরই ভয় লাগে। ওই অবস্থাতেও নিজেকে হিরো মনে হচ্ছে। ফেলেছি তুরুপের তাস। খেলো, নন্দিনী, খেলো। আমি রামায়ণের রাম। আবার এ-ও মনে হচ্ছে—চলে যেতে হবে পৃথিবী ছেড়ে। আবার একটা গানের লাইনও মনে পড়ছে—সাধের লাউ বানাইল মোরে বৈরাগী। মরে যাবার সময় মানুষের কত কি মনে পড়ে। মনটাও ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। ভীষণ ভালবাসা পায় মনে।

আমার বউ আমার বুকে ভর রেখে মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল। যেন বারান্দার রেলিং-এ হাতের ভর রেখে রাস্তার লোক দেখছে। বেশ মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করলে—'কোথায় রেখেছো?'

এই সময় এই প্রশ্নের একটাই অর্থ, পাশবই, চেকবই, সেভিংসে এইসব রেখেছো কোথায়? তুমি তো চললে। সেখানে গিয়ে তো ভুড়ুম ঠুকতে পারবো না। তখনও আমার একেবারে বাক্যরোধ হয়ে যায় নি। অস্পষ্ট হলেও স্মৃতি আর চেতনা দুটোই কাজ করছে। আমি কোনও রকমে বললুম 'ভেবো না তুমিই নমিনি, কাগজ-পত্র, চেকবই, পাসবই সবই আলমারির লকারে আছে। চাবিটা আছে মাটির যে গোপাল মূর্তি তার ভেতরে। রুমালে জড়ানো।' এরপর আর আমার মুখ দিয়ে কোনও শব্দ বেরুলো না, গোঁ করে উঠলাম। আমার বউ বললে—'যাও তোমার সঙ্গে কোনও কথা বলবো না, মানুষকে কেবল তোমার কামড়ানো স্বভাব।' আমি মনে মনে বললুম—হায় রে। এখনও তুমি বুঝলে না, আর হয় তো পনেরো মিনিট পরেই তোমাকে প্রথামতো ডুকরে কেঁদে উঠতে হবে। তুমি ভাবছো আমি বোধ হয় অভিনয় করছি, তা কিন্তু নয়, একেই বলে হার্ট অ্যাটাক! অব্যর্থ পরোয়ানা।' ভাবলুম, কিন্তু বলতে পারলুম না কিছু। কোঁক, কোঁক শব্দ হল কয়েকবার। তখন আমার বউ সরে এসে বললে, 'তোমার সেই অম্বলের ওষুধটা কোথায়। অফিসে আজ কি গিলে মরেছিলে। হার্ট অ্যাটাক না হাতি। একে বলে গ্যাস।

আমি বলতে চাইলুম—'পাগলি, সবাই গ্যাসই ভাবে। মরলে তবেই বোঝা যায় গ্যাস না করোনারি।' প্যাঁক করে একটা শব্দ বেরলো মাত্র। আমার বউ তখন উঠে আলো জ্বালালো। আমার দিকে তাকিয়েই ছিটকে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। স্বপ্নের ঘোরে যেন দেখছি সব। ছেলেকে ডাকছে। ভদ্রমহিলার হইহই করা স্বভাব। এমন ভাবে ডাকছে বাড়িতে যেন ডাকাত পড়েছে। আমার ছেলের

ঘুম সহজে ভাঙে! তার ওপর সবে বিয়ে করেছে। এক সময় ছেলের গলা পাওয়া গেল। ঘুম জড়ানো, বিরক্তি মেশানো গলায় বলছে—'এত রাতে ডাক্তার, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে—নার্সিংহোম? গাড়ি পাবে কোথায়! কোনওরকমে ভোর পর্যন্ত ম্যানেজ করো, তারপর যা হয় করা যাবে। বাবাকে তো চেনো! তিলকে তাল করা স্বভাব। এর আগেও তো দেখেছো!

মনে মনে বললুম, 'তাই না কি সোনা! বাবারা বুঝি তোমাদের সেবার জন্যে অমর হবে। খালি ফুয়েল ঢেলে যাবে সোনা, আর তোমরা শুধু কপচে যাবে! পাখি সব করে রব।'

তিন জোড়া পায়ের শব্দ আমার দিকে এগিয়ে আসছে। চারপাশে বাবুরা এসে গেছেন। আমার ছেলে আবার জাত আমেরিকান। জিনস পরেই ঘুমোয়। উবু হয়ে বসতে পারছে না। এখুনি পেছন ফেঁড়ে যাবে। পুত্রবধূ আমার বুকের উপর হাত রেখে বারে বারে ডেকেই যাচ্ছে, 'বাবা, বাবা, ও বাবা!' যেন হার্ট অ্যাটাকের এইটাই চিকিৎসা, বাবা, বাবা করলেই হৃদয় খুলে যাবে।

আমার বউ বলছে, নিশ্চয় আজ ঘুগনি খেয়েছে। ঘুগনি দেখলে তো আর লোভ সামলাতে পারে না। আজ তো সোমবার। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছি। আজ ওদের অফিস ক্যান্টিনে ঘুগনির ডেট।

আমি সব শুনছি, আর মনে মনে হাসছি। অ্যাতো যন্ত্রণাতেও হাসি। কেন হাসবো না! ছেলেবেলায় কত আবৃত্তি করেছি—জীবন-মৃত্যু, পায়ের ভৃত্য।

ছেলে বলছে—'এই অবস্থা কতক্ষণ হয়েছে?'

'তা প্রায় আধঘণ্টা।'

ছেলে আমার হেসে উঠল। 'আধঘণ্টা! তাহলে জেনে রাখো ব্যাপারটা হার্টের নয়, পেটের। হার্ট হলে কি হত জানো, পাকা আমটির মতো, টুপ করে খসে যেত। এ তোমার ঘুগনি কেস। তলপেটে নারকেল তেল, সাবান আর জল মিশিয়ে ডলতে থাকো। পায়ের তলায় নখ দিয়ে কুড়ু কুড়ু করে দ্যাখো তো।'

আমার বউ বললে, 'মাগো, সাতজন্ম পায়ে সাবান দেয় না, ওই পায়ের তলায় আমি মরে গেলেও হাত দেবো না।'

মনে মনে বললুম—'পিটপিটে বামনী, এখুনি মরলে ওই পায়েই তো আলতা মাখিয়ে ছাপ তুলবে।'

ছেলে বললে, 'তোমার আবার বেশি বেশি। আমি যে প্যান্টের জন্যে নিচু হতে পারছি না।'

বউমা বললে, 'আমি দেখছি।'

আঙুলে বড় বড় নখ। সেই নখ দিয়ে আঁচড়াতে লাগল। আমি ঝড়াক করে পা টেনে নিলুম।

ছেলে বললে, 'বুঝেছি, এ তোমার মাকে টাইট দেবার চেষ্টা। থম্বোসিস হলে পায়ে কোনও সাড় থাকতো না। চলে এস সুমিতা ও স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার, নিজেরাই ফয়সাল করে নিক।'

মনে মনে বললুম, 'ও হে ছোকরা, তোমার বউয়ের আঙুলে যে ফ্যাশানের নখ, অ্যালসেসিয়ানকেও হার মানায়। ওই আঁচড়ে মরা মানুষও ঠ্যাং সরাবে বাপ। পায়ে সাড় থাকলে কি হবে, শ্বাস যে এদিকে বন্ধ হয়ে এলো। পালসটা দ্যাখো, বিট মিস করছে কিনা।'

আমি তিনবার ব্যাঙের মতো কোঁক কোঁক করলুম। ল্যাভেণ্ডার পাউডারের গন্ধ উড়িয়ে নব দম্পতি বিদায় নিল। পড়ে রইলুম আমি আর আমার বোকা বউ। পঁচিশ বছরের পোড় খাওয়া একটি জীব। কোথা থেকে একটা তোয়ালে ভিজিয়ে এনে তলপেটে চেপে ধরল। ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে একটু কাঁদল। বউটার ধৈর্য একটু কম। কোনও কাজ একটানা বেশিক্ষণ করতে পারে না। এমনি মানুষটা বেশ ভালো, তবে অবুঝ। বয়েস হলে কি হবে, বালিকার স্বভাব। আমি চলে গেলে বুড়িটার কি হবে। ছেলের সংসারে আয়াগিরি করতে হবে। ভাবতে ভাবতে আমার চোখেই জল এসে গেল। আমার বউ আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললে, 'তুমি চলে গেলে আমি আত্মহত্যা করবো, মাইরি বলছি, আমি আত্মহত্যা করবো, আমার কে আছে বলো।

তিন চার ফোঁটা চোখের জল টপটপ আমার গালে কপালে পড়ল।

আমি আমার অবশ হাত দুটো তোলার চেষ্টা করলুম। প্রথমে পারছিলাম না। পরে পারলুম। পারলুম মনের আবেগে। মন তো আর হৃদয়ে থাকে না। মেয়েটাকে আস্তে আস্তে পিঠের দিক থেকে জড়িয়ে ধরলুম। রাতের ধরিত্রীর মতো ঠাণ্ডা শীতল একটি শরীর। ধীরে ধীরে আমার হাতের চাপ বাড়ছে কাছে টানছি, কাছে, আরো কাছে। আমার অর্ধ অঙ্গকে। অদ্ভুত এক অনুভূতি, যেন হরিদ্বারের গঙ্গায় স্নান করছি। হাপুস কাঁদছে আমার বউ। আমি কথা বলার চেষ্টা করলুম। পারলুম। আমার বাক্য ফিরে এসেছে। বললুম, 'মাইরি বলছি, আমার একটা মাইল্ড স্ট্রোকই হয়ে গেল। আমি আজ ঘুগনি খাইনি, কিছুই খাইনি। স্রেফ তোমার জন্যেই আমার হৃদয়ের বাধা খুলে গেল।'

আমার বুকের ওপর বউয়ের মাথা। চুলের আর সে শোভা নেই। দেহে

আর সে উত্তাপ নেই, কিন্তু চোখে অনেক জল এসেছে। ভেতরে একটা সমুদ্র তৈরী হয়েছে।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'তুমি আমাকে ভালবাসো?'

আমাকে আঁকড়ে ধরে আমার চির বালিকা বউ ধরা গলায় বললে, 'বুঝতে পারো না বোকা!' আমার চোখের সামনে খেলে গেল অতীতের দৃশ্য একটা গাছ, এক টুকরো জমি, সবুজ ঘাস, এক তরুণ আর তরুণী, কাঁধে মাথা, হাতে হাত। অদৃশ্য এক স্টার্টার বাঁশি বাজিয়ে দিলেন, শুরু হল চলা। আজও চলছি। কোথায় সেই লাল ফিতে! কত দূরে। মনে মনে আমার ছেলেকে বললুম—'কি প্রেম করিস তোরা? দেখে যা প্রেম কাকে বলে? চোখের জল ছাড়া প্রেম হয়!' একটা হৃদয় হলে আজ যবনিকা পড়ে যেত। দুটো হৃদয় মিলেছিল বলেই রয়ে গেলুম। থাকিনা আর কিছুকাল।

নির্জনতায় আমরা ভয় পাই

সরতে সরতে আমরা সবাই খোপে এসে ঢুকেছি। আমাদের এই মধ্যবিত্ত অস্তিত্ব, আমাদের শিক্ষাদীক্ষা, জীবনচর্চা, চিন্তাভাবনা, সবই আমাদের ঝাঁটা-পেটা-আরশোলার মত কানকোভাঙা, দাঁড়া ভাঙা একধরনের প্রাণীতে পরিণত করেছে। চামচে মাপা ধূর্তের জীবন। মেপে মেপে পা ফেলা। কতরকমের শৃঙ্খল? আমাদের বংশপরিচয়, স্ট্যাটাস, মান-সম্মান, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব যেন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্তু। মাকড়সার জালে জড়ানো বাহারী কাচপোকা, সময়ের শক্কা কালো মাকড়সার মত আলপিনের চোখ তাকিয়ে আছে, ধীরে ধীরে সরে আসছে রোমশ দাঁড়া নেড়ে। এই বুঝি আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হল। বাঁধা মাইনের চাকরিটা ষাট বছর পর্যন্ত থাকবে তো? সেই সময়ের মধ্যে ছেলে জীবিকায় প্রতিষ্ঠিত হবে তো? মেয়ের ভাল ঘরে বিয়ে হবে তো? ব্যাঙ্কে বার্ধক্যের সঞ্চয় মাস চালানোর মত সুদ আনবে তো? রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়বে না তো? বাতে পঙ্গু হব না তো? জীবকোষের কোথাও হঠাৎ কর্কট রোগ বাসা করবে না তো? শেষ অবদি বোলচাল, ঠাট-বাট ঠিক থাকবে তো? লোকে সেলাম বাজাবে তো? মৃত্যুটা না ভুগে হবে তো? স্ত্রীর আগে যেতে পারবো তো? ছেলে মুখাগ্নি করবে তো? অশৌচান্তে মস্তক মুণ্ডন করবে তো? শ্রাদ্ধে যথেষ্ট ঘটা হবে তো? দেয়ালে বড় মাপের ছবি ঝুলবে তো! কেউ দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলবে তো! হরেকরকমের তো? জীবন যেন সার্কাস-কন্যার তারে হাঁটা। সব সময় আতঙ্ক, এই বুঝি ভারসাম্য হারিয়ে চিৎপাত হয়ে কয়েক শো ফুট নিচে পড়ে গেলুম। পতন রোধের জন্যে নিচে কোনও জাল বিছানো নেই।

পরিসর যত ছোটই হোক, চারটে দেয়াল চাই। মাথার ওপর ছাদ থাকা চাই দোতলার ঘর হলে ভালো হয়। তার ওপর যেন আরও কয়েকটি তলা থাকে। তাহলে গ্রীষ্মের উত্তাপে তেমন কষ্ট হবে না। দক্ষিণটি যেন খোলা থাকে। সেদিকে একটি মাঠ বা জলাশয় থাকে। দু-একটি বৃক্ষ। বৃক্ষের ডালপালা যেন জানালায় এসে খোঁচা না মারে। ঝড়ের দুলুনির জন্যে যেন মাপা জায়গা থাকে। ডালের ঝাপটায় মাথার ওপর বৈদ্যুতিক তার যেন ছিঁড়ে না যায়। ভোরে দু একটি গান-জানা-পাখি যেন উড়ে এসে গান শুনিয়ে যায়। চব্বিশ ঘন্টা করে যেন অফুরন্ত জল থাকে। মাথার ওপরের প্রতিবেশী যেন শান্তশিষ্ট, ভদ্র হয়।

বেশি কাচ্চাবাচ্চা যেন না থাকে। তাদের বাড়ির মেয়েরা যেন সুন্দরী হয়। হিসেবী জীবনের সমস্যা অনেক। শরীরের বাইরে যত চেকনাই, ভেতরটা নড়বড়ে। বেশির ভাগই পিপু-ফিশুর দল! মুখে বচনের স্টেনগান।

সকালে ভালো কাপে খুসবুদার চা চাই। আবার মানকাবারী চায়ের খরচ নিয়ে চেল্লানোও চাই। বাঙালী বুদ্ধিজীবীর মাখন খাওয়া একটি দর্শনীয় ক্রিয়াকাণ্ড। একশো গ্রামে সারা পরিবার এক সপ্তাহ। কেন্দ্র বা রাজ্য কি বাজেট করে! মধ্যবিত্তের বাজেট এক অসাধারণ অর্থনৈতিক ব্যায়াম। সানমাইকা লাগানো একটি খানা টেবিল না হলে জাতে ওঠা যায় না। আহার শেষে কার ঘাড়ে মোছার ভার পড়বে, এই ভয়ে খবরের কাগজ পেতে খাওয়া। মাখনের পাত্রটি অবশ্যই সুদৃশ্য, ছুরিটিও বেশ চিক্কন। রুটিতে মাখন মাখাবার সময় পারস্পরিক দৃষ্টি বিনিময়। সকলেই সকলের নজরবন্দী। ছুরির ডগা দিয়ে বেশি মাখন কেটে নিলে নাকি? কর্তার বাজেট শেষ মাসে বিকলাঙ্গ হয়ে যাবে। স্নেহবস্তুর মৃদু স্পর্শে মানস আহার। রোজ মাছ না হলে মাথায় বজ্রাঘাত। সে মাছের চেহারা কেমন! মাইক্রস্কোপ দিয়ে খুঁজে নিতে হয়। পাতের পাশে কাঁটা পড়ে থাকে, বেড়াল মুচকি হেসে সরে যায়। বাবু এমন চোষন করেছেন, কাঁটার খাঁজে সামান্য একটু খাইবারও লেগে নেই। ট্যাবলেট আকৃতি দুটি সন্দেশ, শৌখীন প্লেট, ঝকঝকে চামচ, বাহারী গ্লাসে জল, অতিথি সেবার আধুনিক ব্যবস্থা। এর বেশি, ইচ্ছে থাকলেও সঙ্গতি নেই। ইয়ার দোস্তকে মধ্যাহ্ন ভোজনে আপ্যায়িত করার ইচ্ছে হলে এক সপ্তাহ আগে গৃহিণীর কাছে লিখিত আবেদন পেশ করতে হবে। মঞ্জুর হলে তবেই আবাহন জানানো যাবে। সে অবস্থা আর নেই। পকেটে পকেটে ক্যালকুলেটার, ঘরে ঘরে ক্যালকুলেটার। অসময়ে এক কাপ চায়ের প্রয়োজন হলে ডাকাবুকো কর্তাকে ততোধিক ডাকাবুকো গৃহিণীর সামনে গিয়ে মোসায়েবের মত হেঁ হেঁ করতে হবে। অফিসে যাঁর আস্ফালনে কেরানীকুল তটস্থ, গৃহে তাঁর অন্য চেহারা। হাঁগা, হাঁগা করে দিনাতিপাত। আলোচনার বিষয়বস্তু বৃত্তাকার, ওয়াইফ কিম্বা মিসেসের হয় হাইপ্রেসার, না হয় অ্যানিমিয়া, না হয় মাইগ্রেন, না হয় ফ্ল্যাটুলেনস, না হয় অম্বল, না হয় বাত। ছেলের এডুকেশান। আর শ্বশুরবাড়ির কৃতী কারুর সাফল্যের বৃত্তান্ত। কোনও একজন শ্যালক, অথবা শ্যালিকাকে আমেরিকায় থাকতেই হবে। যেমন আমাদের বরাত। তা না হলে শুনতে হবে কেন, কি দেশ! কি মাইনে? দেখতে হবে কেন, হোমিওপ্যাথিক শিশিতে যাবার সময় দিয়ে গেছে বিলিতি প্যারফ্যুম। জামা সাতবার ধোবার পরও গন্ধ লেগে আছে।

একটি খাট চাই। তার ওপর হয় এলাহী একটি ছোবড়ার গদি, সামর্থ্যে কুলোলে আধুনিক ফোম ম্যাট্রেস। লতাপাতা কাটা বেডকভার চাই। সেটি অবশ্যই একসপোর্ট কোয়ালিটি। দাম পঁয়ত্রিশ টাকার বেশি হলে হৃদয় চলকে উঠবে। দামী একটি বেডকভার তোলা থাকবে। মেয়েকে দেখতে এলে, অথবা কর্তার অফিসের বন্ধুরা এলে পাতা হবে। অভ্যাগতদের কেউ তার ওপর অ্যাশট্রে, কি খাবারের প্লেট রাখলে, গৃহিণী অন্তরালে কর্তাকে ফিসফিস করে বলবেন, দিলে বারোটা বাজিয়ে।

বারো মাস পাখার বাতাস চাই। রাতে লোডশেডিং হলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবাই মুখপোড়া। ইলেকট্রিক বিলের অঙ্ক সামান্য বাড়লেই চিৎকার, স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই, ভাইপোতে ঝটাপটি। বাথরুমের আলো জ্বাললে কেউ নেবায় না। লক্ষ্মীছাড়ার দল।

বাজার খরচের চেয়ে প্রসাধনের খরচ বেশি। আধকৌটা পাউডার মেখে মহাদেব হয়ে তার ওপর গেঞ্জি আর জামা। মেয়েরা মুখে সাবান ঘষছে তো ঘষছেই। সাবানদানীতে জল থই থই। পঞ্চাশ ভাগ গলেই চলে গেল, টুথপেস্ট টিউবের আকৃতি ক্রমশই বোম্বাই হচ্ছে। ফ্যামিলি সাইজ। দু'হাতে তুলতে হয়। টিপলে ফুটখানেক বেরোবে। দাঁতে লাগবে আধ ইঞ্চি, বাকিটা বাতিল। পেনি-ওয়াইজ পাউন্ড-ফুলিশের দল।

অভ্যাসের দাস, অর্থনীতির দাস, বাক্সর্বস্ব, অকর্মণ্য এই প্রাণীটিকে হঠাৎ যদি কেউ বলে—যাও বৎস, তোমার সাদা-কলারের চাকরিটি কেড়ে নেওয়া হল, তোমার ভুয়ো নিরাপত্তার বোধ আর রইল না, কথা বেচে, দালালী করে আর চলবে না। ব্যাঙ্কের কাউন্টারে মানুষের সারি, বেতনভোগী বুদ্ধিজীবী, যাঁর বাকচাতুর্যে সবাই অস্থির, জ্ঞানের যিনি হ্যালোজেন বাতি, তিনি সহকর্মীর সঙ্গে কাজ ভুলে খেলার আলোচনায় মশগুল। রেলের টিকিট-ঘুলঘুলিতে হাত ঢুকিয়ে একটি টিকিটের জন্যে আকুলিবিকুলি, ট্রেন ছেড়ে যায়, নিজের অধিকারবোধে ষোল আনা সচেতন কর্মবীর, শুনেও শুনছেন না। এইসব প্রোটিন সচেতন, অর্থ সচেতন, পরিবার সচেতন, স্বার্থ সচেতন, ফ্ল্যাটবাসী, পণ আদায়কারী, কালীমন্দির গমনকারী, হিন্দী ছবিসেবী, পেপারব্যাক প্রেমী কর্মবীরদের যদি বলা হয়, যাও বৎস, ফুটপাথে, নীল আকাশের নিচে নিরালম্ব অবস্থান করো নিজের মুরোদটি একবার যাচাই করো।

তাহলে কি হবে! অনেকেই চোখে ধুতরো ফুল দেখবেন।

অথচ এই স্বাধীন ভারতের বৃহদংশ পড়ে আছে পথের পাশে। মাঠে ঘাটে

ঝুপড়িতে। সব আয়োজনই তো, অর্থশালীদের জন্যে। ভদ্রগোছের একটি আস্তানা—ভাড়া সাতশো। সেলামী পাঁচ হাজার। ভদ্রলোকের দৈনিক জীবনযাত্রার খরচ শতের অধিক। সংখ্যা গরিষ্ঠের মাসিক আয় একশো হলেও খুব হল। এঁদের জন্যেই যত জ্ঞানের কথা, ত্যাগের কথা, পরিকল্পনা যত তামাশা।

তবু এঁরা সুখী। ভাঙা আয়না, ফেলে দেওয়া চিরুনি, বাবুর বাড়ির উচ্ছিষ্ট, রোদে শুকনো রুটি, ফেলে দেওয়া টিনের কৌটো, ছেঁড়া চট, ভাঙা লণ্ঠন, সিনেমারপোস্টার, এইসব সামান্য সামান্য বৈভব নিয়ে জীবনকে যাঁরা নির্ভয়ে চ্যালেঞ্জ করেন, তাঁরাই এ দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ নাগরিক। তাঁদের মাথার ওপর হোর্ডিং-এ সিনেমার রাগী নায়কের বিদ্রোহ, নায়িকার প্রেম, সেরা মিলন সেরা কাপড়ে যুবক-যুবতী, চুলের শ্যাম্পু, মুখের মেক আপ, প্রেসার কুকার, নিরামিষ প্রোটিন, বাট লক্ষ টাকার লটারি। এঁদের লজ্জা দিতে গিয়ে সারা দেশ আজ লজ্জায় সঙ্কুচিত। জীবনের শেষ কথা। মাথার ওপর আকাশ, পায়ের নিচে মাটি। যেতে একদিন সকলকেই হবে সাজানো ঘরের সুন্দর খাট থেকেই হোক আর ফুটপাত থেকেই হোক। তবে মানবতার আকাশ-প্রদীপটি যেন নিভে না যায়।

কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরোলেই পাজি

সব জীবেরই একটা সমাজ আছে। বাঘের আছে। সিংহের আছে। পাখির আছে। কুকুরেরও আছে। সাধারণ কিছু নিয়ম তারা মেনে চলে। ঝাঁকের পাখি, ঝাঁকের মাছ কদাচিৎ নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করে। ক্যানিবলিজম্ নেই বললেই চলে। বাঘে বাঘ মারে না। গোয়ালে দুটো গরু পাশাপাশি বাঁধা থাকলে রাতে একটা আর একটাকে খেয়ে ফেলে না, বা গুঁতিয়ে মেরে ফেলে না। গোয়ালের দরজা খুলে মুংলী গাই প্রতিবেশীর গোয়ালে ঢুকে ঝুমরী গাইকে বলে না, চল্ মাধুকে বাঁশ দিয়ে আসি।

মানুষ খুব বুদ্ধিমান প্রাণী। ভাবতে জানে, ভাবাতে জানে। সারা পৃথিবী তার পায়ের তলায়। আকাশের দূরপ্রান্ত তার দখলে। সুচারু চেহারা। বড় বড় দাঁত নেই। নখঅলা সাংঘাতিক থাবা নেই। মানুষের গ্রন্থাগারে স্থান ঠাসা বই। মগজে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বীজ। মুখে বড় বড় কথা। প্রেম, ভালবাসা, আত্মোৎসর্গ, হিতসাধন। তবু মানুষের মত অনিশ্চিত প্রাণী জীবজগতে আর দুটি নেই।

সাপ ছোবল মারবে জানা আছে। বাঘ ঘাড় মটকাবে ধরে নিতেই পারি। কাকের বাসায় খোঁচাখুঁচি করলে ঠুকরে চাঁদি ছ্যাঁদা করে দেবে, অজানা নয়। মানুষ কি করতে পারে জানা নেই। নির্জন পথে ট্যাকসি-ড্রাইভার হঠাৎ পেটে ভোজালি চেপে ধরে যাত্রীর সব কেড়ে নিতে পারে। ট্রেনের সহযাত্রী হঠাৎ সশস্ত্র ডাকাতের চেহারা নিতে পারে। ক্ষমতালোভী নেতা মায়ের কোল থেকে তার শিশুটিকে কেড়ে নিয়ে ধড়, মুণ্ড খণ্ড খণ্ড করতে পারে। মানুষ মানুষের হাত ধরে টেনে তুলতে পারে আবার গলায় ছুরিও চালাতে পারে।

মানুষের ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া করলে মানুষের ওপর বিশ্বাসের চেয়ে অবিশ্বাসই এসে যায়। ইতিহাসের ধারায় মানুষ যত শিক্ষিত, আলোকপ্রাপ্ত হয়েছে ততই মানুষ সংকীর্ণ আর স্বার্থপর হয়েছে। মানুষের সমাজ বলে আর কিছু নেই। সকলেই আমরা অসামাজিক, আত্মসেবী প্রাণী। স্বার্থ ছাড়া মানুষের সম্পর্ক আজকাল আর টেঁকে না। যতদিন স্বার্থ ততদিন আসা-যাওয়া। স্বার্থের আদান-প্রদান শেষ হয়ে গেলেই আর টিকির দেখা নেই। প্রবাদটি ভারি সুন্দর : কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরোলেই পাজি। অমুককে ধরলে ছেলের চাকরি হতে পারে। সকাল বিকেল আসা-যাওয়া। কুশল বিনিময়। বাড়ির কে কেমন আছে, এমনকি কুকুরটা কেমন আছে! কতই যেন হিতৈষীবন্ধু! তারপর আর

পাত্তা নেই। যাকে মনে হয়েছিল মরলে খাটের সামনের দিকে কাঁধ দেবে, দেখা গেল সে বাঁশ নিয়ে তেড়ে আসছে। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের কালে যা ছিল এখনও তাই আছে। বরং আরও বেড়েছে। অমুকের পাড়ায় খুব হোল্ড আছে, হবু নেতার হাত এসে পড়ল একেবারে কাঁধে। ভাই সম্বোধন। নেতা যেই এম. এল. এ. হয়ে টাটে বসলেন, অমনি অমুক হয়ে গেল লোফার। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কও স্বার্থের সম্পর্ক। প্রেম, প্রীতি, সাতপাকের অবিচ্ছেদ্য বন্ধন, যদিদং হৃদয়ং মম একটা মানসিক সান্ত্বনা, হ্যালুসিনেসান, বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো। যতদিন করতে পারবে ততদিন খাতির। স্বার্থের রোদে প্রেমের শিশির শুকোতে থাকে। শেষটা পরস্পর পরস্পরকে দন্ত প্রদর্শন করে বেঁচে থাকা। স্ত্রী আগে সরে পড়লে, বয়েস থাকলে আবার পিঁড়িতে গিয়ে বোসো। স্বামী, আগে গেলে হাতড়াও বিত্ত কি পড়ে রইল। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে তবে একসেপসান ইজ নো ল। প্রচলিত প্রথা আর বিশ্বাসের তলায় নগ্ন সত্য চাপা পড়ে থাকে। সত্যপ্রকাশে মানুষের সভ্যতা এখনও লজ্জা পায়।

আমি মানুষ বড় ভালবাসি। কখন? যখন বোঝার ভারে ক্লান্ত। তখন শক্ত সমর্থ একজন মানুষ চাই। তার মাথায় মালটি তুলে দিয়ে পিছনে পিছনে চলো, ঝাড়া হাত-পায়ে। আমি মানুষ বড় ভালবাসি। কখন? আমার জমিতে ফসল ফলাবে কে? কে আমার গোলা ভরে দেবে! কারা আমাকে, আমার বাচ্চাকে দুধে-ভাতে রাখবে! ক্ষেতমজুর। কে আমার উৎপাদন যন্ত্রের চাকা ঘুরিয়ে আমাকে শিল্পপতি বানাবে? দিন মজুর। আমি মানুষ বড় ভালবাসি। কখন? যখন আমার কুটোটি নাড়ার অভ্যাস থাকে না, তখন মানদা আর মোক্ষদারা আমার বড় প্রিয়। আমার এপ্‌ট্যাবলিশমেন্টের দরজায় বন্দুকধারী মানুষ, আমি ওপরে উঠব আমার পায়ের তলায় মানুষের পিঠ। আমি তীর্থে যাব পূণ্য সঞ্চয়ে মানুষের কাঁধে চড়ে। এমনকি চিতায় চড়তে যাব চার কাঁধে চেপে; কিন্তু মনে প্রাণে আমি চার দেয়ালের বাসিন্দা। তোমরা সবাই থাকো আমার প্রয়োজনে। তোমার প্রয়োজনে আমি নেই।

আমার জন্মের জন্যে একজন পিতাও একজন মাতার প্রয়োজন ছিল। বুদ্ধি না পাকা পর্যন্ত তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন ছিল। যেই আমার পিপুলটি পাকল তখন আমি এক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। হাত খরচের টাকা না পেলে সন্তান পিতার কান কামড়ে দিতে পারে। পিতা ও সন্তানের হাত কামড়ে দিতে পারে, শেষে দুজনেই হাসপাতালে। এ যুগের প্রকাশিত ঘটনা যা প্রকাশ পায়নি তা আমরা মনে পুষছি।

সকলেরই এক বক্তব্য, আমরা এক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে চলেছি। সমাজ বলে আর কিছু থাকবে কি? আমরা প্রত্যেকেই উদাসীনতার শেষ সীমায় হাজির।

পরস্পর মারমুখী। মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে হাতাহাতি! আইনস্টাইন ঠিক এই আলোচনাই করতে গিয়েছিলেন আর এক বিখ্যাত চিন্তাবিদের সঙ্গে। আর একটি বিশ্বযুদ্ধ মানেই মানবজাতির সম্পূর্ণ ধ্বংস। তাতে সেই জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছিলেন, Why are you so deeply opposed to the disappearance of the human race?

সামাজিক বিশৃঙ্খলার জন্যে বিজ্ঞান অনেকাংশে দায়ী। মানুষ আর মানুষের ওপর নির্ভরশীল নয়। তৈরী হয়েছে যন্ত্রসমাজ। দয়া, মায়া, প্রেম, প্রীতি বেরিয়ে চলে গেছে। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি হল মানুষও এক যন্ত্র। থিঙ্কিং অ্যানিম্যাল। আহার, নিদ্রা, মৈথুন, প্রজনন। সংখ্যায় বাড়ো। রাষ্ট্রনায়ক সৈনিক চায় প্রতিবেশী রাজ্যে হামলার জন্যে। ক্যাপিট্যালিস্ট মানুষ চায় ক্রেতা হবার জন্যে। যন্ত্রের উৎপাদন জেব মানুষের ভোগে লাগাতে হবে, তবেই না মুনাফা! তবেই না আমার গাড়ি, বাড়ি, ফ্যান, ফোন, ফ্রিজ, টিভি। সংখ্যায় বাড়ো। রাজনীতি ঝাণ্ডা তোলার মানুষ চায়। মানুষের মধ্যে জাতিভেদ না থাক ধনভেদ থাকা চাই। একের পেছনে আর এক যদি লেগে না থাকে শাসনের সহজিয়া পদ্ধতি ভেঙ্গে পড়বে। নীতিটা যে, এলোমেলো করে দে মা, লুটেপুটে খাই। মানুষকে মানুষ দিয়ে মারতে হবে। মানুষ দিয়েই ভয় দেখাতে হবে। কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা আঙুল তুলে দেখাবে, দ্যাখো দ্যাখো, কমপালসান আর টেরার বাধ্যবাধকতা আর ভীতির কি যাদু! আমাদের শক্তি আজ কোথায় উঠেছে। সোস্যাল ডেমক্রেসি পৃথিবীতে অচল। Full intellectual growth is dependent on the foundation of open on concealed slavery.

এই বিশাল, বৈরী পৃথিবীতে মানুষ কখনই একা বাঁচতে পারবে না। জীবন একটা যৌথ প্রচেষ্টা। চাঁদির চাকতি ছুঁড়ে আলু, পটল, ট্যাড়শ পাওয়া যায় ঠিকই। সেবাও হয়তো পাওয়া যায়। তার মানে এই নয়, সামাজিক সদ্ভাবের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। জনপদ মধ্যরাতে যখন ঘুমে অচেতন মানুষ তখন কার ভরসায় চার দেয়ালের আশ্রয়ে পড়ে থাকে? চৌকিদার! বিজ্ঞানের যুগেও কোনও কোল্যাপসিব্‌ল গেট, রোলিং শাটার, কি থাভার লক নিরাপত্তার শেষ কথা নয়। তবু ঘুম আসে, স্বপ্ন আসে। কেন আসে? সেই বোধ থেকে আসে, আমি মানুষের সমাজে বাস করছি। মহাশূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছি না। ভারি সুন্দর একটি ইহুদী-প্রবাদ আছে—A man can eat alone, but not work alone.

জ্ঞানের অভাব নেই তবু চিন্তাশীল মানুষ আজ একঘরে। কে কার কথা শোনে। যন্ত্রের যুগে মানুষ এক বোধশূন্য গতি। কোনও কিছুতেই আর আস্থা

রাখা যায় না। সমস্ত প্রতিষ্ঠান মর্যাদা হারিয়েছে। সমস্ত ইজম খড়ের পুতুল। সমস্ত আশ্বাস একধরনের ভাঁওতা। পৃথিবী এখন বড় বেশি উত্তপ্ত। মানুষ যেসব বাঁধন দিয়ে পশুটিকে খাঁচায় আটকে রেখেছিল সে বাঁধন খুলে গেছে। পশ্চিমের দেহবাদ আর জড়বাদ আমাদের মগজ ধোলাই করে দিয়েছে। সংস্কৃতি মৃত। সহবত অদৃশ্য। সংকর মতবাদে মানুষ একটি ফুটো চৌবাচ্চা। মুখ দিয়ে ঢোকাও, পেছন দিয়ে বের করে দাও আর ইন্দ্রিয়ে পাখার বাতাস মারো। ও মরছে মরুক আমি তো বেঁচে আছি। দুটো হাত নিজের সেবাতেই ব্যস্ত। দুটো পা শুধু নিজের লক্ষ্য-বস্তুর দিকেই ছুটছে। চোখ দুটো নিজের ভাল ছাড়া কিছুই দেখতে পারে না। মগজ কু-চক্রে ঠাসা। এমন জীবের সমাজ থাকে কি করে! তাই যে কোনও বাড়িতে সারা রাত ধরে ডাকাতি হতে পারে। নিত্য বোমবাজি যেন মন্দিরের সন্ধ্যারতি। দশজনে ধরে একজনকে পেটাতে পারে। কেউ মাথা ঘামাবে না। গৃহবধূর গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া চলে। রামের ঘর সামলাতে শ্যামের উপদেশ পাওয়া যাবে না। শিক্ষিত মানুষ শুধু একটি কথাই বলতে শিখেছে—নান্ অফ মাই বিজনেস। আমি বেশ থাকলেই বেশ হয়ে গেল। মাঝে মাঝে শুধু অভিযোগ—পাড়ায় আর টেকা যায় না ভাই। কুকুর আর অ্যান্টি-সোস্যালস এত বেড়েছে! চতুর্দিকে করাপসান। অ্যান্টি-সোস্যালস তো আমরা সকলেই। অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, দু'জনেই তো এক শ্রেণীতে। আমরা নিজের ত্বকে ক্রিম ঘষছি, আয়নায় মুখ দেখছি, বড় বড় উপদেশ ছুঁড়ছি আর শ্যান পাগল বুঁচকি আগল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সমাজের ত্বকে খড়ি ফুটছে, চুল উসকো, চোখ লাল। নিজের পেটে ভিটামিন অন্যের পেটে বাতাস। এক ধরনের ধর্মও বেঁচে আছে। বাঁক কাঁধে তারকেশ্বর। কালীর মন্দিরে দীর্ঘ লাইন। হাতে চ্যাঙারি, লটকানো জবার শুঁড় দুলছে, কোণে গোঁজা ধূপ ধোঁয়া ছাড়ছে। এদিকে ভিখিরি দেখলে গৃহকর্তা তেড়ে উঠছেন। চিবিয়ে চিবিয়ে উপদেশ ঝাড়ছেন—চাকরি করতে পারো না! মহাশয় এদেশে চাকরি আছে! ক্ষমতা থাকলেও বঙ্গ সন্তানের জন্যে আপনার বুক কাঁদবে না! আমি ছাড়া সবাই লোফারস, স্কাম অফ দি আর্থ।

মানুষ যতটা অমানুষ হয়েছে, অমানুষ তার চেয়ে বেশি অমানুষ হয় নি। কুকুর কুকুরই আছে। বাঘের স্বভাব বাঘের মতই আছে। মধ্যাহ্নে পাখির জটলায় ঝাঁকের ধর্ম বজায় আছে। মানুষ জানে, আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ/সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাং।। ধর্মো হি তেষামধিকোবিশেষো ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।। তবু মানুষ যেন কেমন আচ্ছন্ন। সূর্যে গ্রহণ লেগেছে।

উতলা দখিণ বাতাসে

গোটা দুয়েক ঋতু বড় লাজুক হয়ে পড়েছে। দর্শক সচেতন অভিনেতার মত। মঞ্চের প্রবেশ দ্বারে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি মারে। অবশেষে প্রয়োগকর্তার ধাক্কা খেয়ে মঞ্চে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। অস্পষ্ট কয়েকটি সংলাপ বলে ছুটে পালায়। কোথায় হেমন্ত! কোথায় বসন্ত! দখিন দুয়ার সামান্য উন্মোচিত হয়। মন কেমন করা বাতাস ছুটে আসে। সতর্ক প্রকৃতি তৎক্ষণাৎ দুয়ার টেনে দেন। বড় সাবধানী। বসন্ত আমাদের জীবন ছুঁয়ে যাক্, এ যেন তাঁর ইচ্ছা নয়। আমরা গ্রীষ্মে দগ্ধ হব। বর্ষায় তালগোল পাকাবো। সুখ আমাদের সহ্য হবে না।

এক সময় বসন্ত ছিল। ছিল আমাদের ছাত্রজীবনে। মনে ছিল, না বাইরে ছিল ভেবে দেখতে হয়। মনেই না-কি মধুরা! বয়েসেই শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্ত! মন যদি ফুল না ফোটে, উদ্যানভরা ফুলে কি করবে! মনে যদি কোকিল না ডাকে, গাছের কোকিলে কি হবে! মাইণ্ড ইন ইটস ওন প্লেস কেন মেক এ হেল অফ হেভন অ্যান্ড হেভন অফ হেল।

সেদিন এক নিউট্রিসানিস্টের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। এখন না-কি দু'ধরনের ম্যাল-নিউট্রিসান দেখা যাচ্ছে। গরিবের অপুষ্টি আর ধনীর অপুষ্টি। কারুর জুটছে না, আর কারুর এত জুটছে যে জীবনে অরুচি ধরে যাচ্ছে। ইয়া বড় এক তালশাঁস সন্দেশ নিয়ে মা ছুটছেন আদুরে ছেলের পেছন, পেছন। খেয়ে যা বাবা, খেয়ে যা বাবা। ছেলে নাকে কেঁদে বলছে আমার আর ভালো লাগে না। ফেলে দাও নর্দমায়। ছেলের ইস্কুলে গিয়ে মা দেখলেন, একটি ছেলে ভারি হৃষ্টপুষ্ট, তেল চুকচুকে। অমনি শুরু হল নিজের ছেলেকে তিরস্কার। কেন তুই অমন হতে পারিস না। ডিম, ছানা, দুধ, মাংস, ভিটামিনের আক্রমণ শুরু হল। ছেলে ভাবছে এর চেয়ে উপবাস ভালো ছিল। মার্ক টোয়েনের প্রিন্স অ্যান্ড পপারের মত।

বাড়ি একেবারে ফেটে যাচ্ছে। কী ব্যাপার! রোজ মুরগীর ঠ্যাং চিবিয়ে চিবিয়ে পরিবারস্থ সকলের প্রাণ ওষ্ঠাগত। ছানা নিয়ে দক্ষযজ্ঞ। মেয়ে বলছে, যম এত লোককে নেয় আমায় নেয় না কেন। ছেলে খাটের তলায় সেঁদিয়ে বসে আছে। ধরতে গেলেই থাবা মারছে। মা চিৎকার করে কর্তাকে বলছেন, পুলিসে খবর দাও, টিয়ারগ্যাস চার্জ করে বের করে আনুক শয়তানকে।

কর্তা বলছেন, আগে মশামারা ধূপ দিয়ে ট্রাই করো। ফেল করলে

লঙ্কাপোড়া ধোঁয়া দাও! ওদিকে বাইরের ফুটপাথে? কর্পোরেশনের রেলিঙে বাবুদের বাড়ি থেকে চেয়ে আনা রুটি শুকোচ্ছে। আজ চলবে, কাল চলবে। বাজারের পাশ থেকে কুড়িয়ে আনা পচা শাকসব্জি ফুটপাতের নর্দমার ধারে ফেলে মরচে-ধরা একখন্ড লোহা দিয়ে তরিবাদি করে কোটাকাটা হচ্ছে, যেন চীনে রেস্তোরাঁয় এখুনি ভেজিটেব্‌ল চৌ চৌ বসবে। ভাঙা হাঁড়িতে জল ফুটছে। পাশে বসে আগুনে ভাঙা প্যাকিং বাক্সের টুকরো ঠেলছে বাঙলার বধূ, বুকে তার মধু, নয়নে নীরব ভাষা।

বসন্ত আর লজ্জায় আসে না। কী হবে এসে। কোথায় উদ্যান! কোয়েলা কোথায়! কোথায় সূক্ষ্ম উত্তরীয়ধারী, দীর্ঘ কেশ কবি! কোথায় যৌবন মদালসা নায়িকা। বসন্ত আসবে কোথায়? মনুমেন্টের তলায়, যার তলদেশ থেকে উৎসারিত সমস্ত রাজনৈতিক বাণী এখন স্তূপাকার আবর্জনা। বড় সুন্দর প্রতীকী দৃশ্য। কিছু শূকর শাবক ছেড়ে দিলেই সম্পূর্ণ একটি পরিকল্পনা। এই পঙ্ক থেকেই রাজনীতির পদ্মসমূহ প্রস্ফুটিত হয়ে দিকে দিকে শোভিত। চামচা-ভ্রমরের দল ভনভন করছে। আর বিরহীর দল বলছে ঃ কোয়েলিয়া গান থামা এবার/তোর ওই কুহু তান/ভালো লাগে না আর।

বৃদ্ধরা যেমন বলেন, সে একটা সময় ছিল, যখন ঘিয়ে ঘি ছিল, তেলে তেল ছিল, মানুষে মানুষ ছিল। ঋতুতে ঋতু ছিল। আমিও বলি, আমাদের যৌবনে বসন্ত ছিল। সন্ধ্যের দিকে রাস্তাঘাট বসন্তের বাতাসে কেমন যেন ভিজে ভিজে হয়ে উঠত। মাতাল বাতাস দুলে উঠত বারান্দা থেকে ঝোলানো চিত্রবিচিত্র শাড়িতে। লোডশেডিংয়ের কোনও আতঙ্ক ছিল না। ঘরে ঘরে আলো, হাসির ফোয়ারা। কুলফি মালাই হেঁকে যেত পাড়ায় পাড়ায়। প্যাঁঠার ঘুঘনি আসত আর একটু বেশি রাতে। রকে রকে জমাট আড্ডা। এরই মাঝে প্রজাপতি উড়িয়ে, গোড়ের মালা গলায়, বর চলে যেত চোখের সামনে দিয়ে হুস করে। দূর থেকে ভেসে আসত সানাইয়ের প্যাঁচানো সুর। গহনার দোকানের দেয়ালজোড়া আয়নায় আয়নায় লাখ লাখ চোখে লোভ ঝলসাতো। ফাগুন এসেছে, ফাগুন। আগুন আসছে পিছু পিছু। ফিন ফিনে পাঞ্জাবি উড়িয়ে বিক্রেতা ক্রেতাকে জড়োয়ার সেট দেখাচ্ছেন। ওদিকে বহদূরে তাজমহলের মাথার ওপর চাঁদ উঠছে। আগ্রা ফোর্টে বসে আছে সাজাহানের প্রেতাত্মা। সেনেট হলের থামের মাথায় মাথায় বিনিদ্র পায়রার দল বুকের কষ্টে কোঁত পাড়ছে। গোটা তিনেক ভালো সরবতের দোকান ছিল। চটে বরফ পুরে কাঠের মুগুরের ঠ্যাঙানি। ভেতরে জমাট জলের কুঁচি কুঁচি হবার কান্না। গেলাসে গেলাসে

সাদাঘোলে গোলাপী সিরাপের নেশা। আরকের গন্ধ ছুটছে, ভ্যানিলা, স্ট্রবেরি, গ্রীন ম্যাঙ্গো, পাইনঅ্যাপল। প্রেমসমুদ্রে বরফ যেন হাবুডুবু। বিয়ে বাড়ির গুরুভোজনে বরযাত্রী হাঁসফাঁস। পানবিড়ি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। চুনোটকরা ধুতি পেছনে পেখম মেলে আছে। মিহি পাঞ্জাবির তলায় গেঞ্জির আভাস। সোডা লেমনেড চেয়েছেন। বোতলের মুখে বায়বীয় জলের গ্যাজলা হাত বাড়িয়ে সিক্ত বোতল নিতে নিতে ক্রেতা আয়নায় নিজের মুখ দেখছেন। বন্ধুর শ্যালিকাটি মনে বড় দোলা দিয়েছে। পানের খিলি নেবার সময় হাতে হাত ঠেকেছে।

ওস্তাদ আসর ফেলেছেন ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটের হলে। পরজ বসন্তে আলাপ চলেছে। সমঝদার বলছেন একেবারে স্পেলবাউন্ড করে দিলে হে। কি সুর! তিন সপ্তকে সহজ আনাগোনা। দুদিকে দুই বিশাল তানপুরা ম্যাও ম্যাও করে সুর ছাড়ছে। ওস্তাদজী মাঝে মাঝে সুরমণ্ডলে আঙুল টানছেন। সপ্তসুর ঝিলিক মেরে উঠছে। কর্মকর্তারা বুকে ব্যাজ এঁটে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ঘুরছেন। কারুর কারুর কাঁধে এখনও শাল। বড় সাবধানী। দখিনা বাতাস মৌজের সঙ্গে বসন্তও ছড়ায়। সাবধানের মার নেই, মারের সাবধান নেই। গাড়ি এসে দাঁড়াল যন্ত্রপাতি নিয়ে নামছেন বেগম আখতার। রাত দুটোয় বসবেন বড়ে গোলাম আলি। লম্বালিস্ট। সারারাত চলবে মাইফেল। শ্রোতারা ভাঁড়ের চা খেয়ে ঘুম তাড়াচ্ছেন। সারেঙ্গি ওদিকে সুরের মোচড় মারছে। মাঝেমাঝেই রহিশ আদমিদের গাড়ি আসছে। সরব অভ্যর্থনা, আসুন আসুন। বোতল গেলাসে ঢালছে রঙিন মদিরা। রক্তস্রোতের মত মৃদু কুলু কুলু শব্দ। ওস্তাদজী ঠুংরির মুখ ধরেছেন, মুসে তো কুছু বোল।

মির্জাপুরের তেলেভাজার দোকানে হামানদিস্তায় মশলা গুঁড়ো হচ্ছে, ঢাউস, ঢাউস, ঢন ঢন। ফাঁকা স্ট্র্যান্ড রোডে একটি মাত্র ছ্যাকড়াগাড়ি, ছিড়িক ছিড়িক শব্দে চলেছে। চিৎপুরে কবাবের দোকানে বিশাল হাঁড়ি কাত হয়ে আছে। তলায় ধিকি ধিকি করছে কাঠকয়লার আগুন। তাওয়ায় রোগনজুস চর্বির মধ্যে পিটির পিটির করছে। কেওড়া, জায়ফল, জাফরানের গন্ধ উড়ছে বসন্তের বাতাসে। দোকানে ঠাসা খদ্দের। নাখোদার তলায় সার সার দোকানে আতরের পলকাটা শিশি আলোয় চিক চিক করছে। কাঠির আগায় জড়ানো তুলোর কুঁড়ি সার সার ফুটে আছে।

নিস্তব্ধ অফিসপাড়া। বিশাল বিশাল বাড়ির তলায় নিস্পন্দ রাস্তা পড়ে আছে চওড়া ফিতের মত। বাতাস লেগেছে ছেঁড়া শালপাতায় ঠোঙায়। বিহারীরা

ঢোল পেটাচ্ছে আর তারস্বরে হোলির গান গাইছে, রামা হো শ্যামা হো। বসন্তের রাত যত বাড়ছে, মানুষের ফূর্তি তত বাড়ছে। দেশে তখন এত ঘাতক ছিল না। রাত ছিল শান্তির। পাড়ায় পাড়ায় বোমবাজি ছিল না। বোমারুরা হয়তো ছিল ভ্রূণের আকারে ভবিষ্যতের গর্ভে। দশভরি সোনার গহনা পরে সুন্দরী মাঝরাতে পান চিবোতে চিবোতে ঘরে ফিরছেন নিঃশঙ্ক। বসন্তের মত আইন-শৃঙ্খলাও তখন অদৃশ্য হয়ে যায়নি। শীতের ধোঁয়াশা ভাসিয়ে নিয়ে গেছে বাতাস। ঝনঝনে রাত। তারার খই ফুটছে আকাশে। বাংলার ছড়ানো প্রান্তর পড়ে আছে নিচে। অযোধ্যাপাহাড়ের দিক থেকে রাস্তা বাঁক নিয়েছে, যেদিকে বাঘমুণ্ডি সেদিকে। রাস্তা নামতে নামতে শুয়ে পড়েছে মজানদীর বুকে। ভিজে বালিতে পা দেবে যাচ্ছে। চারপাশের বনস্থলিতে বসন্তের বাহার লেগেছে। আসছে পলাশ লাল ডানা মেলে। সুপ্ত পৃথিবী। পাহাড় ধ্যানমগ্ন। মানুষ কিন্তু জেগে। বিশাল শিমুলের কোটরে প্রদীপ জ্বলছে। ছায়ায় কাঁপছেন দেবতা বোঙ্গা। বসন্তের মধ্যরাতে সাঁওতালিদেরও পরব শুরু হয়েছে। পাথরে কোঁদা সচল নারীমূর্তি প্রদীপ হাতে চলেছে দেবস্থানে। কচি ছাগশিশু থেমে থেমে কাঁদছে। ধূপ আর ধুনোর ধোঁয়া সরু চুলের গুচ্ছের মত আকাশের দিকে উঠছে। মাদলের শব্দ ফিরে আসছে। বসন্তের বড় আনন্দ। মানুষ এখনও তাকে চেনে। শুধু সে-ই জেগে নেই, মানুষও জেগে আছে। পাহাড়ঘেরা ছোট্টপ্রান্তর পৃথিবীর বিরাটমঞ্চের পাদপ্রদীপের আলো যেখানে পড়ে না, সেখানেও প্রচারের টানে নয়, প্রাণের টানে মানুষ ছুটে এসেছে উৎসবের সাজে। পক্ষী-শাবক মায়ের কোলের কাছে জেগে উঠেছে মাদলের শব্দে। ভাবছে এই আমার সুন্দর পৃথিবী। এরই আকাশে একদিন আমাকে ডানা মেলতে হবে। বাজ আছে। থাকুক। তার ক্ষুদ্র ডানার চেয়ে আকাশ অনেক বড়। পথ চলে গেছে দূরে, বাঙলার সীমান্ত পেরিয়ে বিহারের দিকে। শালের ডালে নতুন পাতার পদশব্দ। সারা বনভূমিতে প্রাণের আগমনের রিন রিন শব্দ। শীতের ঘুম ভেঙে সরীসৃপ এসেছে গর্তের বাইরে। মাছের মা ডিম পাড়ছে শীতল জলের কিনারায়। হরিণ শাবক জল খাচ্ছে চকচক শব্দে। সারা পৃথিবী যখন সুপ্ত তখন পাথরের গা বেয়ে কুলকুল করে জলধারা নেমে আসছে ক্ষুদ্র একটি জলাধারে। প্রকৃতির প্রতি কোণে কোণে যে খেলা চলেছে, মানুষ হয়তো আর সাক্ষী নয়, সাক্ষী কীটপতঙ্গ, অরণ্যজীবন, বৃক্ষশাখা, ক্ষুদ্র বনলতা। মানুষের নিদ্রা আছে। সৃষ্টির চোখে ঘুম নেই। তার মণিবন্ধে বাঁধা নেই সময়ের ঘড়ি। বসন্তে পৃথিবী বড় মোলায়েম। স্তনদায়িনী মাতার ভিজে বুকের মত।

মধ্যরাতে মালকোষে গান ধরেছিলেন শিল্পী। ভূত জাগানো রাগ। গান শেষ হবার পরও সুর ভাসছে, মধ্যগগন দ্বিপ্রহরের চিলের মত। পূব আকাশে আলোর চিড় ধরেছে। শেষরাতের বাতাসে শীতের কঙ্কাল-আঙুলের ছোঁয়া। কে যেন দেখেছিল নদীর চরে পড়ে আছে একটি কঙ্কাল তার হাতের আঙুলে তখনও ধরা আছে একটি শাঁখার আঙটি। পায়ের ওপর স্থির হয়ে বসে আছে নীল একটি মাছরাঙা। স্বচ্ছ জল বাতাসের স্পর্শে বৃত্তাকার ভেঙে ভেঙে একদা জীবনের সাক্ষী কঙ্কালটিকে জীবনের কোন্ গান শোনাতে চাইছে! সেই উষার আকাশ লক্ষ করে শিল্পী ধরেছেন শেষ গান, যোগিয়া রাগে। ধর্মে ইসলাম, আবাহনে মানব। সৃষ্টিকর্তাকে সুরে সুরে বলতে চাইছেন—দাতা তু হ্যায় করতার। অশ্রুসিক্ত সুর ধূপের ধোঁয়ার মত ঘুরে ঘুরে আকাশপানে উঠছে। ফুলশয্যায় নায়কের কোলের কাছে নায়িকার খোঁপাভাঙা মাথা। রাতের রজনীগন্ধার স্তবক থেকে টুপ করে খসে পড়ল একটি ফুল। রঙ্গমঞ্চে ভেলভেটের পর্দা নামছে। প্রাচীন আয়নার সামনে যৌবনের অঙ্গরাগ তুলছেন প্রবীণ অভিনেতা। দেবদারুর শাখায় সুর তুলছে উতলা কোকিল। কোথায় সেই বসন্ত! মানুষ মেরে ফেলেছে। সব পথ বন্ধ করে দিয়েছে কংক্রিটের দেয়াল তুলে।

যে ট্রেন থামে না যার কোন ইস্টিশন নেই

গাছের পাতা আছে। সারা বছরের স্মৃতি নিয়ে সব পাতা একদিন ঝরে যায়। আবার নতুন পাতা আসে। আবার ঝরে যায়। এই ভাবেই চলতে থাকে গাছ যতদিন বাঁচে। মানুষের পাতা নেই। মানুষের পাতা হল তার জীবনের মুহূর্ত। জীবন থেকে অনবরতই মুহূর্ত ঝরে চলেছে দুঃখ-সুখের স্মৃতি নিয়ে। চলার পথে জমছে। অদৃশ্য কিন্তু অনুভব করা যায়। চলতে গেলে মচমচ শব্দ হয় না ঠিকই, তবু একেবারে নীরব নয়। কান পাতলে অতীত থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

রাতের মেলট্রেন ছুটছে দুলে দুলে, পাহাড়, পর্বত, নদী, নালা ডিঙিয়ে। ষষ্ঠীর দিন। বাঙলার দুর্গামণ্ডপে ঢাকে কাঠি পড়ছে। আকাশে পেঁজা তুলোর মত শরতের মেঘ। একফালি চুষে খাওয়া লেবু-লজেন্সের মত চাঁদ মাটির কাছে ঝুলছে। তৃতীয় শ্রেণীর কামরা। পূজোর ছুটিতে কলকাতায় চলেছে বেড়াতে। ঠাসা ভীড়। আমরা চার কলেজীবন্ধু, এপাশে ওপাশে, মাথার ওপর দুটো বাঙ্কে পা ছড়িয়ে বসে আছি। তারস্বরে গান চলেছে। কখনও রবীন্দ্র-সংগীত কখনও হিন্দি ছায়াছবির হিট গান। বেপরোয়া চার যুবক। ভবিষ্যতের স্বপ্ন চোখে। কোনও দায়-দায়িত্ব নেই। দুর্ভাবনা নেই। অর্থনৈতিক দাসত্ব নেই। কামরায় তিলধারণের জায়গা নেই, তবু আমাদের কি উল্লাস। একেবারে নীচের আসনে পাশাপাশি দুটি মেয়ে বসে আছে। মাঝে মাঝে চোখে পড়ে যাচ্ছে। আমাদের গান আর কথা বলার উৎসাহ আরও বেড়ে যাচ্ছে। যার ভাণ্ডারে যত রসিকতা আছে সব উজাড় করে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিযোগিতা চলছে চারজনে। স্বয়ম্বর সভায় যেন চার রাজপুত্র। রাজকন্যার মালা জিতে নেবার জন্যে অলিখিত, অঘোষিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ওই ভীড় ট্রেনে সেই দোলায়িত রাত যেন স্বপ্নের রাত, আরব্য রজনীর রাত।

ভোরবেলা জানলা গলে আমরা চার পরাজিত রাজপুত্র যশিডী স্টেশানে হুমড়ি খেয়ে পড়লুম। সামনেই অস্পষ্ট আলোয় ঘুমন্ত একটি পাহাড়। গায়ে কুয়াশা হাত বুলোচ্ছে। কেমন একটা শীত শীত ভাব। রুক্ষ, পাহাড়ী মাটি। একটি দুটি পাখি থেমে থেমে ডাকছে। বন্ধ কামরা থেকে একেবারে মুক্ত প্রকৃতির কোলে। ট্রেন নিজের বাঙ্কে ঘুমন্ত মেয়ে দুটিকে নিয়ে পটনার দিকে চলে গেল। এতক্ষণ ধরে মৃদু চালসে ধরা আলোয় রোমান্সের যে জাল বোনা

হয়েছিল তা ছিঁড়ে-খুঁড়ে গেল। আমরা আর প্রতিদ্বন্দ্বী নই। প্রাণের বন্ধু। ভোরের নীলচে আলোয় অদৃশ্য কালির লেখার মত চারপাশের দৃশ্য ফুটে উঠছে। টাঙা চলেছে আমাদের চারজনকে নিয়ে রিখিয়ার দিকে। ইউক্যালিপটাসের গন্ধ ভেসে আসছে।

বহুকাল আগে ঝরে গেছে জীবনের সেই সব মুহূর্ত। সেই চার বন্ধু কে কোথায় ছিটকে গেছে আজ। কোনও যোগাযোগ নেই। সেই স্বপ্নের মেয়ে দুটি সেই ট্রেনের সঙ্গে সেই যে হারিয়ে গেল আর দেখা হলো না কোনও দিন। বয়েস বেড়ে গেল, চুল পেকে গেল, মন বদলে গেল। স্বাধীন, স্বপ্নময় ছাত্রজীবন দাসজীবন হয়ে গেল। যা চাওয়া হয়েছিল, তার কিছু পাওয়া গেল, কিছু পাওয়া গেল না। এখনও প্রতি রাতে হাওড়া থেকে সেই ট্রেন ছাড়ে। সেই একই ভীড়। ওপরের দুটি বাঙ্কে কেউ না কেউ থাকে। যশিডী স্টেশানে নেমে টাঙা চেপে কেউ না কেউ রিখিয়ায় যায়। আমি ও যেতে পারি, তবে সে অন্য আমি। তরুণ নয়, প্রবীণ আমি। আমার পাশে আমার সেই তিন বন্ধু থাকবে না। নিচের বাঙ্কে সেই মেয়ে দুটি থাকবে না। ঝরা পাতা যেমন গাছের ডালে আবার আটকে দেওয়া যায় না, ঝরা মুহূর্তও তেমনি জীবনে আর জুড়ে দেওয়া যায় না। যা গেল তা গেল।

একবার দেরাদুন থেকে কলকাতা আসার পথে সাহারাণপুরের কাছে কি একটা ছোট গ্রামের পাশে ট্রেন বিকল হয়ে গেল। আমার সহযাত্রী ছিলেন এক বাঙালী ব্যারিস্টার। তাঁর সে রকম অহমিকা ছিল না। ভীষণ আমুদে মানুষ ছিলেন। গোটা চারেক ভাষায় অনর্গল কথা বলার ক্ষমতা। আদর্শনিষ্ঠ। আমার হাতে ইংরেজি গোয়েন্দা কাহিনী দেখে বললেন, 'ও সব নেগেটিভ বই পোড়ো না। মানুষের পরমায়ু খুব বেশি নয়, অথচ ভালো ভালো বইয়ের সংখ্যা এত বেশি, এক জীবনে পড়ে শেষ করা তো যাবে না, পড়তে হলে বেছে বেছে সেই সব বই পড়ো, মনের উন্নতি হবে।' মানুষকে যাঁরা সৎ পরামর্শ দেন তাঁরা মহান। কুপথে নিয়ে যাবার সঙ্গী অনেকে আছে, সুপথের সঙ্গী লাখে এক। মানুষটির আরও পরিচয় পেলুম অন্য একটি ঘটনায়। ইংরেজিতে বলে 'টিট ফর ট্যাট' অর্থাৎ যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল। পাশের কূপের এক অবাঙালী ভদ্রলোক জানলার রেলিং-এ ভিজে গামছা বেঁধে দিয়েছিলেন। বাতাসে সেই গামছার ঝাপটায় আমরা জানলার ধারে বসতে পারছিলুম না। আমার সেই সহযাত্রী উঠে গিয়ে অনুরোধ জানিয়ে এলেন, গামছাটা খুলে নিন। কোনও ফল হল না। তখন তিনি স্যুটকেস থেকে একটা কাঁচি বের করে কচাৎ করে গামছার

যে অংশটা আমাদের ঝাপটা মারছিল, কেটে ফেলে দিলেন। পরিণাম যাই হোক না কেন, তাঁর নীতি ছিল যেমন কুকুর তেমনি মুগুর।

যখন জানা গেল ট্রেন ঘন্টা চারেকের জন্য রুখে গেল, তখন আমরা দু'জনে নেমে পড়ে গ্রামের দিকে হাঁটতে লাগলুম। আমগাছ, জামগাছ, পথ চলে গেছে এঁকেবেঁকে গমের ক্ষেতের পাশ দিয়ে। ছোট্ট একটা মন্দির। মহাবীর দাঁড়িয়ে আছেন পর্বত কাঁধে। একেবারেই দেহাতি গ্রাম। কোথাও কিছু নেই। হাঁটতে হাঁটতে আমরা একটা প্রাইমারি স্কুলের কাছে চলে এলুম। প্রধান শিক্ষক ক্লাস ছেড়ে এগিয়ে এলেন। খুব খাতির করে আমাদের বসালেন। এমন কি লাড্ডু আর চা খাওয়ালেন। জীবনের কিছু মুহূর্ত সেখানে পড়ে আছে। যা আর তুলে আনা যাবে না। ট্রেন হয়তো রোজই ওই গ্রামের পাশ দিয়ে আসে, গ্রামের হয়তো আরও উন্নতি হয়েছে, প্রাইমারি স্কুল হয় তো হাই স্কুল হয়ে গেছে। সেই বয়স্ক প্রধান শিক্ষক হয় তো আর নেই, আর কোথায়ই বা আমার সেই ব্যারিস্টার সহযাত্রী। সব পেছনে ফেলে আমার সময়ের রেলগাড়ি সোজা এগিয়ে চলেছে। রোজই তাতে নতুন যাত্রী, নতুন কথা, নতুন ভাবনা।

একটা হুলো এই মাত্র মারা গেল। বাগানের গুমটি ঘরের ছাদে তার মৃতদেহ পড়ে আছে। পরশুদিন তাকে খাইয়ে দাইয়ে রাত এগারোটা নাগাদ দূর দূর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। মধ্যবিত্তের সাজানো সঙ্কীর্ণতায় উটকো একটা বেড়ালকে আশ্রয় দেবার উদারতা নেই। পরের দিন সন্ধ্যেবেলায় কে এসে বললে, হুলোটা বাইরে পড়ে আছে, ভীষণ অসুস্থ। মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠছে। একটা স্ট্রেচার মত করে বেড়ালকে তুলে আনা হল। ওষুধ এল, পথ্য এল, সারারাত ঘরে পরিচর্যা চলল। গুমটি ঘরের ছাদ হল তার হাসপাতাল। কম্বল চাপান হল, তার ওপর প্লাস্টিকের আচ্ছাদন। শীতও পড়ল জবরদস্ত। চারপাশ হিহি করছে। কুয়াশায় প্রকৃতির যেন দমবন্ধ হয়ে আসছে। গাছের পাতায় খাঁজে খাঁজে কান্নার জল জমেছে। সামান্য একটা ইতর প্রাণীর জন্যে প্রকৃতির এত বেদনা। না শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের নিষ্ঠুরতায় অশ্রু বিসর্জন। কে বা কারা ইট মেরে হুলোর পেছনের পা দুটো ভেঙে দিয়েছে। শুধু তাই নয় বিষ খাইয়ে দিয়েছে। এই বিশাল বিপুল নিষ্ঠুর পৃথিবীতে তুচ্ছ একটা বিড়ালের বাঁচার অধিকার নেই। বেড়াল জীবনের শেষ কয়েকটি মুহূর্ত পড়ে রইল ওই গুমটি ঘরের ছাদে। আর কোন দিন সে মা মা করে পায়ে পায়ে ঘুরবে না। আমার পেছনে পেছনে দোকান পর্যন্ত পোষা কুকুরের মত ছুটবে না। অন্য বেড়াল হয় তো আসবে; কিন্তু তাদের ডাক আলাদা, স্বভাব আলাদা। তার সমস্ত

মুহূর্ত আমার ঝরা মুহূর্তে হারিয়ে গেল। আমি যতদিন বাঁচব ততদিন ওই গুমটি ঘরের ছাদের দিকে তাকালেই দেখতে পাব একটা মৃত বেড়ালের অর্ধনিমিলিত চোখ। আমার হাতের টর্চের আলোয় স্থির। কলকে গাছের একটা ডাল ঝুকে আছে মাথার ওপর। ফোঁটা ফোঁটা শিশির পড়ছে সময়ের বিলাপের মত।

কতদিন ভেবেছি জীবনের সুখ কি দুঃখ যদি ইচ্ছে মত ফিরিয়ে আনা যেত। আমরা একবার জলপাইগুড়ি গিয়েছিলাম। আমি, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, সমরেশ মজুমদার, বুদ্ধদেব গুহ, বিমল দেব, মনোজ মিত্র। তিস্তালজের একটা ঘরে সকাল হচ্ছে। মনোজবাবু বিছানা থেকে কম্বলের পাহাড় নিয়ে উঠে বসলেন। প্রভাতী চা এল। তারপর আমরা দু'জনে সারা জলপাইগুড়ি শহরটা পদব্রজে চষে এলুম। মনোজবাবু বাঁধের ওপর একটা সিকি কুড়িয়ে পেলেন। বিশাল বিশাল কৃষ্ণচূড়া নীল আকাশে ঝাড়ু মারছে। রাস্তার ধারের চায়ের দোকানে লুচি খাওয়া, গরম চা। সেলুনে দাড়ি কামানো। সেই সেলুনে আবার পটের মত এক সার ছবি ঝুলছে। একটু বেলার দিকে জলপাইগুড়ি কলেজের একদল ছাত্রীর আগমন। প্রাণচঞ্চল, প্রশ্নে প্রশ্নে ভরপুর। একেবারে কোরকের মত। বহু শীত, বহু গ্রীষ্ম, বর্ষার মাজাঘষায় জীবন রঙচটা হয়ে যায়নি। সারি সারি কপালে সারি সারি টিপ। ছোট টিপ, বড় টিপ।

সদরে মধুর টি-এস্টেটের ডাকবাংলোর রাত একটায় যেন স্বপ্ন দেখছি। সবুজ লনে আলোর পিচকিরি। হিহি শীত। পরের দিন রাত দেড়টায় কম্বলমুড়ি দিয়ে কালাচিনি ফরেস্টে পাগলা হাতি দেখতে যাওয়া। কথা বলায় বুদ্ধদেববাবুর ধমক, "চোপ, জঙ্গলে কিছু দেখতে হলে কথা বলা চলে না।" ঘোর অন্ধকারে এক ডজন মানুষ ছায়ার মত দাঁড়িয়ে। প্রাচীন অরণ্যের বুক চিরে পথ চলে গেছে সিঁথির মত। গাছের ফাঁকে ফাঁকে পিংপং বলের মত জোনাকি ভাসছে। পাতার শব্দ হলেই বুক কেঁপে উঠছে, ওই রে পাগলা হাতি। রাত আড়াইটের সময় বাংলোয় খেতে বসে চা-বাগানের সেক্রেটারির অতিথি আপ্যায়নের আন্তরিকতা। স্যুপে মরিচ নেই বলে কর্মচারীদের ধমকধামক। নিঃশব্দ পৃথিবী ঘুরে যাচ্ছে অক্ষপথে। রাত থেকে দিন, দিন থেকে রাত। প্রকৃতিতে কত বিশাল ঘটনা ঘটে চলেছে। আর বিন্দুর মত স্থানে, তিলের মত কিছু প্রাণী নিজের তৈরি নিরাপদ সীমানায়, মরিচ মরিচ বলে উতলা হচ্ছে।

হাজার চেষ্টা করলেও ওই সব মুহূর্ত আর ফিরবে না। সুনীলবাবুর সেই গান দুটি, যে দুটি গান গেয়ে সমরেশ বসু মহাশয়ের জন্মদিন পালন করা হল ঠিক রাত বারোটায়, 'আশালতা, কলমিলতা ভাসছে অগাধ জলেতে।' আর

'এবার মরলে সুতো হব।' অনুরোধ করলে তিনি যে-কোনও দিন গাইতে পারেন, কিন্তু ঠিক ওই দিন, ওই সময় যেমন লেগেছিল, তেমন কি আর লাগবে? মনোজবাবু আবার দুটি গানকে এক করে, অদ্ভুত এক টু-ইন-ওয়ান বানিয়েছিলেন। স্মৃতিতে সব চালান হয়ে গেছে। চোখ বুজলে দেখা যাবে বাংলার সদাশিব নাড়ুবাবু সমরেশবাবুর দিকে একগুচ্ছ মধ্যরাতের শিশির ভেজা ফুল এগিয়ে দিচ্ছেন। সে অনুভব কিন্তু মনের চোখে!

আমরা দুঃখে ফিরে যেতে চাই, সুখে ফিরে যেতে চাই, যে হাত ধরে শৈশবে মেলায় ঘুরেছি সেই হাত আবার ধরতে চাই, যে আমায় কাঁদিয়েছে তাকেও চাই, যে আমায় হসিয়েছে তাকেও চাই, যে চোখে ভালবাসার প্রথম শিখা কেঁপেছে তাকেও চাই। চাই কিন্তু পাই না। অন্ধকার নিস্তব্ধ অরণ্যের প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে থাকা, ফেলে আসা পথে চলতে গেলে শুধু মচমচ শব্দ। সবই মৃত। অতীত মৃত, ভবিষ্যৎও মৃত। মুহূর্ত নবীন হয়েই প্রবীণ হয়ে যাচ্ছে। এ বড় জ্বালা। এ এমন এক রেলগাড়ি যা থামতে জানে না, যার কোনও স্টেশান নেই। যাত্রীরা সব মৃত মুহূর্ত। তবু কোনও অপরাহ্ন বেলায় মাটি থেকে যখন ভিজে ভিজে গন্ধ বেরোয়, পাতায় লেগে থাকে দীর্ঘশ্বাসের মত মৃদু বাতাস, তখন দূরের পানে তাকিয়ে আমরা প্রতীক্ষা করতে পারি, জীবনে এমন কিছু আসুক যা হারায় না। জীবনের একমাত্র সত্য অপেক্ষা।

তোমার ম্যাও তুমি সামলাও

আমাদের দেশে কবে
সেই ছেলে হবে।
নিজেকে না বিকিয়ে
বিয়ে করে আসবে।।

বুঝলেন, আমাদের কোনও দাবি-দাওয়া নেই। আমি মশাই কশাই নই যে, মেয়ের বাপের ছাল ছাড়াবো একটু একটু করে নুন দিয়ে! আপনারা মেয়েকে যেমন সাজিয়ে দেবেন, ঠিক সেইভাবেই মা আমার ঘরে এসে উঠবে। অনেকে ফ্রিজ দেয়, কালার টিভি দেয়, টেপ, ডেক কি স্টিরিও, টু-ইন ওয়ান দেয়, আয়না ফিট করা স্টিলের আলমারি দেয়, গাড়ি বা স্কুটার দেয়। বিশ-বাইশ ভরি সোনা দেয়। বোম্বাই খাট দেয়। ফোমের গদি দেয়, এক সিন্দুক বাসন দেয়, শ'খানেক প্রণামির শাড়ি দেয়। যার যেমন দিল। সমুদ্রের মত হৃদয় যাদের, তারা দেয়। যাদের মুরগি হৃদয়, তারাই কেবল কোঁকোর কোঁকোর ডাক ছাড়ে। ইংরেজিতে একটা কথা আছে মশাই, 'হোয়্যার দেয়ার ইজ উইল, দেয়ার ইজ এ ওয়ে।' ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়। আমার কোনও দাবি নেই। তবে আপনারও তো একটা প্রেস্টিজ আছে। যার মন বড়, তার মেয়ের মন বড় হবে। যার নিজের মন ছোট, তার মেয়ের মনও ছোট হবে। মেয়ে আসবে মাথা উঁচু করে। পিতৃ-পরিচয়ে দুম দুম করে ঘুরবে। সবাই বলবে, দেখতে হবে তো কেমন বাপের মেয়ে একেবারে ছপ্পর ফুঁড়ে দিয়েছে। আমাদের কোনও দাবি নেই। আমার নিজের বিয়ের সময় একটা সাইকেল চেয়েছিলুম। শ্বশুরমশাই জামাইয়ের আবদার শুনে হাঁ হাঁ করে হেসে উঠলেন, 'সাইকেল? তুমি ওই বি. টি. রোড দিয়ে সাইকেল চেপে লগবগ লগবগ করতে করতে যাবে! আমার মেয়েকে বাবাজীবন, জেনেশুনে বিধবা হবার রাস্তা পরিষ্কার করে দিতে পারব না। কোনও বাপ তা পারে না।'

তখন আমার মাথায় ধাঁ করে বুদ্ধি খেলে গেল, 'বেশ, সাইকেলের বদলে তা হলে সাইকেল রিকশা দিন। আমি একটা লোক রাখব। রোজ আমাকে বাস-স্ট্যান্ডে পৌঁছে দেবে। সস্ত্রীক সিনেমায় যাব। আপনার নাতি এলে স্কুলে যাবে। এদিকে ডেইলি চার-পাঁচ টাকা রোজগারও হবে। বেবি ফুডের পয়সা উঠে যাবে।'

শ্বশুরমশাই বললেন, 'তথাস্তু।'

সেই সাইকেল রিকশার পেছনে স্ত্রীর গর্ভধারিণীর নামটি লিখে দিলুম, নিস্তারিণী। সহধর্মিণীর মুখটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেই 'নিস্তারিণী' চেপে আমরা জোড়ে সিনেমায় যেতুম, বাজার করতুম। এখন আমার ষোলটি রিকশা। চারটি সন্তান। ডেইলি আশি-নব্বই টাকা একস্ট্রা রোজগার। একে বলে, রথ দেখা কলা বেচা। মিথ্যে বলব না, আপনার মেয়েকে আমাদের পছন্দ হয়েছে। নাকটা একটু চাপা, তা হোক, বাপের বাড়িতে একটু আয়েসে থাকে, শ্বশুরবাড়ির চাপে গাল দুটো একটু ভাঙলেই নাকটা খাড়া হয়ে উঠবে। চোখ দুটো আর একটু টানা টানা হলে মন্দ হত না। কিন্তু মেয়ে তো আর অর্ডার দিয়ে করানো যায় না। ঈশ্বরের হাত। পয়সা ঢাললে ট্যারারও ভাল বিয়ে হয়। একটা মোটর গাড়ি কি তিনতলা একটা বাড়ি মেয়ের সঙ্গে ধরে দিন। ভালো ভালো পাত্তর হাঁউমাঁউ করে ছুটে আসবে। বিয়ের বাজারে মেয়ে তো মশাই বাই-প্রোডাক্ট, আসল তো সোনা, ঘর সাজানো ফর্নিচার, গাড়ি, বাড়ি, ফ্রিজ, টিভি। আমরা আবার অতটা ঠোঁটকাটা নই। চোখের চামড়া আছে।

পরনে চেক চেক লুঙ্গি, গায়ে চিকনের কাজ করা চপল-চরিত্রের পাঞ্জাবি। ঠোঁটে নাচছে খঞ্জন পাখির ন্যাজের মত 'বার্ডসাই'। চোখ দুটো ধূর্ত শৃগালের মত। সারা সংসার থেকে একটা আঁশটে গন্ধ বেরোচ্ছে। প্রাচুর্য আছে, কিন্তু বড় এলোমেলো, আগোছালো। এমন ঘরে মেয়ে এসে উঠবে। এমন একজন দুঁদে মানুষকে 'বাবা' বলে ডাকতে হবে। এক পরিবেশ, এক সংস্কৃতি থেকে উৎপাটিত হয়ে এসে নতুন মাটিতে শিকড় চালাতে হবে। বিবাহেই নাকি নারী-জীবনেই সার্থকতা। মেয়েরা এইটাই নাকি চায়। বাপ হয়ে যা ভাবা যায় না, মেয়েরা নাকি একটা বয়সে তারই জন্যে উৎকণ্ঠিত।

জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ তিনটি নাকি বিধাতার হাতে। কে কোথায় জন্মাবে, তার ওপর নিজের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। মৃত্যু কোথায় কখন বাঘের মত ঝপাং করে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে টুটি চেপে ধরবে, জীবনের অজানা। বিবাহও তাই। কে যে কার সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে এসে গাঁটছড়া বেঁধে বসবে, ভবিতব্যই জানেন। তারপর নাকের জলে, চোখের জলে হবে, না হাসির ফোয়ারা ছুটবে, সে হল হাতেনাতের ব্যাপার। অভিজ্ঞ মানুষ বলেন, ইয়ে হ্যায় দিল্লিকা লাড্ডু, যো খায়া ও পস্তায়া, যো নেহি খায়া ওভি পস্তায়া। স্বামী স্ত্রী এমন দুই ধাতু, গলে মিশে ভরনের কাঁসাও হতে পারে, আবার আলাদা আলাদা তামা, পিতল হয়ে পাশাপাশি সারা জীবন একই সংসারে থেকে বক্সিং লড়ে যেতে পারে। কেউ ছাড়াতেও আসবে না, মাথাও ঘামাবে না। বড় প্রাইভেট অ্যাফেয়ার। সংস্কৃতে বলাই আছে : অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে/প্রভাতে মেঘডম্বরে/দাম্পত্যের কলহে চৈব/বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। উলটোটা হল: মেষযুদ্ধে নৃপশ্রাদ্ধে/প্রভাতে

মেঘডম্বরে/সাপন্থ কলহে চৈব। লঘ্বারম্ভে বহুক্রিয়া।

যাঁরা ম্যাচ মেকার্স, তাঁদের আর কী। একজন সর্বস্ব বেচে মেয়ে পার করে ফতুয়া পরে ঘুরবেন। ছেলের বাপ প্রথমে মহানন্দে গোঁফে তা দেবেন। ছেলের বউ এনেছেন। ঘর একেবারে ভরে গেছে। দান-সামগ্রীতে পা ফেলা যাচ্ছে না। পৃথিবীতে অনেক রকমের ইতিহাস লেখা হয়েছে। শ্বশুরমশাইদের ইতিহাস লেখা হলে জানা যেত, শুধু মেয়ে বা ছেলের ভাগ্য নয়, শ্বশুরমশাইদেরও ভাগ্য বলে একটা জিনিস আছে। শশ্রুমাতাদেরও আনন্দের কোনও কারণ নেই। পরের মেয়ে বাগে পেয়েছি, এইবার কাদায় ফেলে ঠাসবো, শিলে ফেলে দাঁত ভাঙবো, ডালকুত্তা দিয়ে ছেঁড়াবো। সে গুড়ে বালি। পাল্টাচ্ছে। তেমন মেয়ে হলে বছর না ঘুরতেই সংসারে ফাটল ধরিয়ে দেবে। হাড়ে দুব্বো গজিয়ে ছেড়ে দেবে। পুত্রটিকে এমন কব্জা করে নেবে, তখন তিনি আর বাপ-মাকে চিনতেই পারবেন না। হ্যাঁগা-র পেছন পেছন মিনমিন করে ঘুরবেন। অবশেষে একদিন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে আলাদা আস্তানায় গিয়ে উঠবেন মিস্টার অ্যান্ড মিসেস।

এ যুগ তো আর সে যুগ নয় যে, মরদ জুতি কো সাথ বাতচিত করেগা। সেই গল্পটি মনে পড়ছে। দুই ভাইয়ের একইসঙ্গে বিয়ে হল। বিয়ের পর বড় আর ছোটো দুজনে দু' জায়গায় চলে গেল। অনেকদিন পরে ছোট এল দাদা কেমন আছে দেখতে। দাদাকে দেখেই তার চক্ষুস্থির। এ কী চেহারা! মাথা জোড়া টাক, তোবড়ানো গাল। এ কী রে দাদা? তোর এ হাল কে করলে?

তোর বউদি।

কেন তুমি শাদির পয়লা রাতেই বেড়াল কাটোনি বুঝি?

সেটা কী?

তাহলে শোনো। বিয়ের রাতে বউয়ের বেড়ালটা বড় ঝামেলা করছিল। মিউ মিউ। আমি একবার বললুম চুপ। শুনলো না। তখন তাকে সাবধান করলুম, আমি তিনবার বলব, তারপর অন্য ব্যবস্থা। তিনবারেও যেই শুনলো না অমনি তরোয়ালের এক কোপ! বউকে বললুম, আমি তিনবারের বেশি কোনও কথা বলি না। কী কাজ যে হল রে ভাই সেই থেকে! আমার আর কোনও সমস্যাই নেই।

অত্যাচারিতা স্ত্রী যেমন আছে, অত্যাচারী স্ত্রীরও তেমনি অভাব নেই। প্রায়ই শোনা যায়, আগুন জ্বালিয়ে দিলে ভাই! বাড়িতে আর ঢুকতে ইচ্ছে করে না। লেডি ম্যাকবেথ স্বামীকে দিয়ে খুন করালেন, এমনই ছিল তার উচ্চাশা। টলস্টয়ের মত মানুষ স্ত্রীর ঘ্যানঘ্যানানি আর প্যানপ্যানানির চোটে আত্মহত্যাই করলেন বলা চলে। স্ত্রীয়াশ্চরিত্র দেবা ন জানন্তি কুতঃ মনুষ্যা। পণপ্রথা সামাজিক অভিশাপ। যারা বউ মারছে, তারা কেউই স্বাভাবিক মানুষ নয়, তারা

ক্রিমিন্যাল। যে সব স্ত্রী ঘর জ্বালাচ্ছে, তাঁরাও সকলেই সাইকোলজিক্যাল পেশেন্ট। এই সব লোভী, নির্বোধ মানব-মানবী আমাদের সমাজের আলসার।

যাঁরা সুস্থ, স্বাভাবিক, তাঁরাও কিছু কিছু প্রথার শিকার। যেমন মেয়ের বাপ মনে করেন, কিছু দিতেই হবে সকলেই দেয়। না দিলে প্রেস্টিজ থাকে না। ছেলের বাপ মনে করেন, সব ছেলেই তো পায়, আমার ছেলে পাবে না কেন। তাছাড়া মেয়ে যেহেতু ছেলের ঘরে আসে, সেই হেতু ছেলের বাপের এক ধরনের অহংকার থাকে। অনেকে বলেন, ছেলের বিয়েতে নিজের গাঁটের পয়সা খরচ কেন? দীর্ঘদিনের বিভিন্ন প্রথায় হরেক রকমের গলদ ঢুকে আছে। সংস্কারের প্রয়োজন। চিৎকার বা মিছিলের আন্দোলন অর্থহীন। আইনেও কিছু হবে না। ঘুষ নেওয়া বা দেওয়া সমান অপরাধ। আইনও আছে। তবু ঘুষ বন্ধ হয়নি। কোনও কোনও দেশে ব্যাভিচারীকে ইট মেরে মেরে ফেলার প্রথা আছে। তাতে কী হল? ব্যাভিচার বন্ধ হয়েছে? দেহব্যবসা বন্ধ করার জন্য আইন আছে, তবু পতিতালয় জমজমাট। মানসিক সংস্কারের জন্যে মানুষকে ধার্মিক হতে হবে। ঘন্টা-নাড়া ধার্মিক নয়। আমরা মোটা মোটা বই পড়তে শিখি, নিজেকে পড়তে শিখি না। ধর্ম হল নিজের সংস্কার এই যুগেও আমি বহু সুখের সংসার দেখেছি। রোজ সকালে বাজারে আমার সঙ্গে এক দম্পতির দেখা হয়। দশাসই কর্তা, ছোটোখাটো গিন্নি। যেন এক-জোড়া কপোত-কপোতী। কর্তা জিজ্ঞেস করেন, হ্যাঁগো আজ ঝিঙে কিনবো?

ঝিঙে? ঝিঙে কী হবে?

কেন, পোস্ত দিয়ে।

না, কাল হয়েছে।

তবে থাক। ঢ্যাড়স কিনি, কচি ঢ্যাড়স।

ফ্রয়েডকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনার দাম্পত্য সুখের কারণ কী? ফ্রয়েড বলেছিলেন, খুব সোজা। আমার স্ত্রীকে আমি প্রকৃতই অর্ধাঙ্গিণী মানে করি, অ্যান্ড সি ইজ মাই বেটার হাফ। আমার ইচ্ছেটাকে কখনোই তার ঘাড়ে জোর করে চাপাই না।

'মা তোমার জন্যে দাসী এনেছি' এই সনাতন উক্তি জিভে নেই হয়তো, কিন্তু মনে আছে। যাক, ওসব গোলমেলে ব্যাপারে না যাওয়াই ভালো। কেঁচো খুড়তে সাপ বেরোবে। মিষ্টান্ন ইতরে জনা। তুমি টোপর মাথায় পিঁড়িতে বোসো। আমরা একদিন ভুরিভোজ করে তিনদিন উল্টে পড়ে থাকি। তারপর তোমার ম্যাও তুমি সামলাও। বেশি ম্যাও ম্যাও কোরো না। কথায় আছে, প্রথম মাস স্বামী বলে—স্ত্রী শোনে। দ্বিতীয় মাসে স্ত্রী বলে—স্বামী শোনে। তৃতীয় মাস থেকে দুজনেই বলাবলি করে, প্রতিবেশীরা কানে হাত চাপা দিয়ে শোনে।

হাসতে মানা নেই

রমাপ্রসাদ লিখলেন, এই সংসার ধোঁকার টাটী। ও ভাই আনন্দবাজারে লুটি। এই অসীম রসবোধের জোরে বাঙালি এখনও টিকে আছে। জীবনটাকে তেমন জোরালোভাবে নিলে, জাতটা মারামারি করে মরে যেত। রসিক বাঙালির পাকে পাকে রস। অনেকটা জিলিপির মত। খাদ্যে রস, কাব্যে রস, কথায় রস, দেহে রস, একাদশী-অমাবস্যায় মালুম হয়ে অনেকের। বন্যা, প্লাবন, খরা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, শোষন, শাসন, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, দেশ-বিভাগ, ঠাসাঠাসি, গাদাগাদি, মুদ্রাস্ফীতি, অর্থাভাব, কর্মাভাব, কোনও কিছুতেই বাঙালিকে কাবু করা গেল না। এক ধরনের কাঁচ আছে, যার ভেতর দিয়ে তাকালে সব কিছুই হাস্যকর হয়ে ওঠে। বাঙালির চোখ সেই ধরনের কাঁচ।

বাঙালি এক সময় ভোজনবিলাসী ছিল। মহিলাদের হাতে রান্নার অনেক প্যাঁচ ছিল। কুটে বেটে, সাঁতলে, সেঁকে সারাটা জীবন অক্লেশে কাটিয়ে দিতে পারতেন। বিচিত্র সব পদ। কোনও জাত ভাবতে পারে, নারকেলের জল বের করে, তার ছোট ফুঁটোর মধ্য দিয়ে একটি একটি করে খোলা-ছাড়ানো চিংড়ি মাছ ঢুকিয়ে আগুনে পুড়িয়ে এমন একটি বস্তু বানানো যায়, যার গন্ধেই জিভে জল আসে! আর খেতে বসলে, বর্তমান কালের একটা কার্ডের বরাদ্দ চালের চাহিদাতেই আটকে রাখা যাবে না। সামান্য কচুর ডাঁটা, রন্ধন-নিপুণার হাতে এমন চেহারা নিতে পারে, ছোলা, বড়ি আর নারকেলকোরা সহযোগে আহারে বসে আপসে গলা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসবে 'যুগ যুগ জিও'। রসিক কবি আবেগে লিখে ফেললেন, সন্দেশ, গজা, সীতাচুর, মতিচুর, রসকর, সরপুরিয়া। মিষ্টান্নে বিশাল তালিকার সামান্য কয়েকটি পদ। আরও আছে। এই বাঙালির মাথাতেই আসে, গরুকে সের-দুই গোলাপজাম খাইয়ে দুধে গোলাপ-গন্ধ আনার চেষ্টা।

এখন বাঙালি চাপে পড়ে, চেয়ারের পায়া-চাপা আরসোলার মত একটু কেতরে পড়েছে। মন-টন সামান্য ছোটো হয়ে এসেছে। এক সময় বাঙালির মেজাজ কী ছিল। রাত বারোটার সময় অতিথি এলে, গৃহকর্ত্রী ময়ান দিয়ে ময়দা মাখতে বসে যেতেন। রাত আড়াইটার সময় অতিথির সামনে পরিবেশিত হত ফুলকো লুচি, বিবিধ তরকারি সহযোগে।

পিতা পুত্র সংসারে দুই ইয়ার। একটি নমুনা ডায়ালগ—ছেলে : খুব তো বাতেলা মারো, দেখি একটা ক্রিকেটের টিকিট ম্যানেজ করো তো । বাবা :

ক্রিকেটের তুই বুঝিস কী? ছেলে : চল্, তোমার চেয়ে ভাল বুঝি। স্লিপ। গালি, একস্ট্রা কভার। বাপ ছেলে কাঁধ ধরাধরি করে চলল টিভি দেখতে।

তিরিশে এ সব ল্যাঠা ছিল না। বিকেলে ঘণ্টাকতক গাদি, কবাডি কি ফুটবল ছেলেরা মায়ের আঁচল ধরে গোবৎসের মত মানুষ হত। মাঝে মাঝে মা'র আদেশে বাবাকে বাইরের ঘরের আড্ডা থেকে ভয়ে ভয়ে এই ভাবে ডাকত: বাবা, আপনাকে ভেতরে একবার ডাকছেন। তিরিশের বাবারা সংসারের উপর পেপার ওয়েটের মত চেপে বসে থাকতেন। ষাটের বাবাদের কোনো ওয়েটই নেই; সব ফুরফুরে কৃষ্ণকান্ত।

তিরিশের বাবারা বেঁচে থাকলে এখন দাদু। তাঁরা খুব সমীহ করে, নাতিকে ডাকার প্রয়োজন হলে ডাকেন—বিশ্বরূপবাবু, প্রভু বলছে ইচ্ছে করে চেপে যান। তিরিশের দাদুরা নাতিকে ডাকতেন—এই শালা এদিকে শোন। এখন 'শালার' বদলে দাদুকে কান ধরে পার্কের বেঞ্চিতে বসিয়ে দিয়ে আসা হবে, আনসি-ভিলাইজড বলে। বুড়ো বয়সে ধোপা নাপিত বন্ধ হয়ে যাবে। কী দরকার বাবা, পড়ে আছি গোলাপবাগের এক পাশে। দেখি না ষাটের বাবাদের সিভিলাইজড কেরামতি!

কী হল দাদা

কিছু উদাসীন মানুষ যেমন আছেন, কিছু অতি আগ্রহী মানুষও আছেন। এঁরা হলেন 'কী হলো দাদা'-র দল। চারিদিকে যা কিছু ঘটছে, এঁদের নাক বাড়িয়ে জানা চাই । 'কী হলো, কী হলো' করে এঁদের ভেতরটা সব সময় লাফাচ্ছে। কিছুতেই সুস্থির হয়ে থাকতে দিচ্ছে না। এদিকে তাকাচ্ছেন, ওদিকে তাকাচ্ছেন। রাস্তার ছোটোখাটো কোন জটলা দেখলেই একটা কাঁধ উঁচু করে, ডিঙি মেরে মেরে, ঘাড়টাকে পারলে সারসের মত লম্বা করে দেখে নিতে চান কিসের জটলা, কাকে ঘিরে জটলা, না পারলে প্রশ্নে প্রশ্নে উত্যক্ত করে তোলেন, 'কী হলো দাদা, কী হলো দাদা?'

আমি নিজেও একটি 'কী হলো দাদা'। বহবার অপ্রস্তুত হয়েছি, অপমানিত হয়েছি, তবু স্বভাব না যায় ম'লে। অল্প বয়সেই সংশোধন করে নেবার মত কানমলা একাধিকবার খেয়েছি, তবু শিক্ষা হয়নি। বাসে মাখোমাখো হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। সবাই আছেন। কিছুক্ষণের এই যন্ত্রণা সকলেই চোখ বুজিয়ে পার করে দিতে চাইছেন। আমার চোখ কিন্তু খোলা। দাঁড়িয়ে থাকলে চলমান রাস্তার যতটুকু দেখা যায়, ততটুকু এক ফালি রিবনের মত উল্টোদিকে হৃহু করে ছুটে চলেছে। পা দেখছি, ভাঙা ফুটপাত দেখছি, নর্দমা দেখছি, দোকানের সিঁড়ির ধাপ দেখছি, গরুর নিচের আধখানা দেখছি। হঠাৎ দেখলাম, তিন-চার জোড়া পা দ্রুত ছুটছে, একটা অন্য ধরনের হল্লা। সঙ্গে সঙ্গে 'কী হলো দাদা'। আমার পেছন দিকটা ডেঁয়ো পিঁপড়ের মত উঁচু হয়ে আমার পেছনে দাঁড়ানো লোকটিকে পেছনের দিকে ঠেলে দিল, আমার উর্ধ্ব অংশ সামনে ভেঙে সিটে-বসা দুটি প্রাণীর মাথার ওপর দিকে চাঁদোয়া তৈরী করে আমার কৌতূহলী মুখটাকে জানালার ফাঁকে পরিপূর্ণ চন্দ্রের মত শোভনীয় করে ধরে রাখল। সামনে দোমড়ানো আমার এমত একটি শরীর বাসের দোলায় চিড়িয়াখানায় একহাতে গাছের ডাল ধরে ঝুলে থাকা শিম্পাঞ্জির মত ডাইনে বাঁয়ে দুলতে লাগল। আমার বুকের ঘষায় বসে-থাকা চরিত্র মাথার চুল এলোমেলো হতে লাগল। আমার কোমরের সংঘর্ষে পেছনে দাঁড়ানো মানুষরা অনবরত সামনের দিকে উথলে উঠতে থাকলেন। 'কী হলো দাদা? দৌড়োচ্ছে কেন?'

শিক্ষিত মানুষরা সাধারণত মেয়েলী প্রশ্নের জবাব দেওয়াটা অসম্মানজনক বলে মনে করে থাকেন। তিন জোড়া পা হঠাৎ কেন দৌড়োচ্ছে, আমাকেই তা

দেখে জেনে নিতে হবে। এই অবস্থায় আমাকেই অনেকের প্রশ্ন— 'কী হলো দাদা?'

মশারির চালের মত আমার ঝুলে পড়ার কারণটা কী? যাঁদের মাথার ওপর 'কী হলো' বলে ঝুলে পড়েছিলুম, তাঁরা দু'হাত দিয়ে ঠেলেঠুলে সোজা করার চেষ্টা করলেন। আমি সোজা হয়ে এদিকে ওদিকে তাকিয়ে একটু হাসি হাসি মুখ করে সহযাত্রীদের কী হয়েছে জানিয়ে দেবার প্রয়োজন অনুভব করে বললুম— 'কিছু হয়নি। ট্রাম ধরার জন্যে দৌড়োচ্ছে।'

শিক্ষিত মানুষ আবার অনেক কথা বিশ্বাস করেন না। কারুর মুখেই কোনো ভাবান্তর হল না। তবু কী হল যেমন জানা দরকার, কী হয়েছে তেমনি জানানোও দরকার।

সাত সকালেই পাশের বাড়িতে ধুম ঝগড়া বেঁধেছে। পুরুষ কণ্ঠ ও নারী কণ্ঠের কোরাস উচ্চগ্রামে। আমার মাথা ঘামাবার মত কোনো ব্যাপারই নয়। স্বচ্ছন্দে চা খেয়ে বাজার চলে যেতে পারি। কিন্তু আমি হলুম গিয়ে 'কী হলো' দাদা। উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখতেই হচ্ছে—'হলোটা কী'? পাঁচিলের এপাশ থেকে প্রতিবেশীর উঠোনের দিকে আমার মুণ্ডুটাকে জ্যাক দিয়ে ধড় থেকে তুলে ধরলুম। বাঃ, বেশ সুন্দর দৃশ্য। বড় ভাই পরান্নভোজী ছোটো ভাইকে জুতো দিয়ে দলাই-মলাই করে রক্ত সঞ্চালনের ব্যবস্থা করছেন। ছোটো ভাইয়ের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মধ্যস্থতার জন্যে বড় ভাই সম্পর্কে একগাদা অভিযোগ আমার দিকে ছুঁড়ে দিল। অভিযোগের ভাষা খুব শালীন নয়। আমি যেন পাঁচিলের এপাশে জজ সাহেব। সকালে গার্ডেনিং করছিলম। মামলাটা আমার হাতে এসে গেল।

পারিবারিক কেচ্ছার ম্যানহোল খুলে গেছে। বড়র হাতের জুতো শূন্যেই তোলা রইল। সাময়িক বিরতি। ছোট ভাই সম্পর্কে তাঁরও নানা অভিযোগ। বড় যদি স্বার্থপর শয়তান হন, ছোটো চোর এবং লম্পট। সঙ্গে সঙ্গে আমার মুণ্ডু গুটিয়ে এল। 'কী হলো দাদা'-রা কখনো সমস্যার গভীরে যেতে চান না, বা সমাধানে এগিয়ে যান না। সালিশীর দায়িত্ব তাঁদের নয়। কী হল? ঘোটাঘুটি জানা হয়ে গেলেই তাঁরা উদাসীন মুখে সরে পড়েন, যেন কিছুই হয়নি। পরের ঘটনা লোকমুখে জেনে নেন—তারপর কী হল? তারপর কী হবে?

'কী হল' দাদাদের পেছনেও 'কী হল দাদা'-রা থাকে। রাস্তার দিকের ঘর। ছেলেকে পড়াতে বসেছি। আজকালকার ছেলেদের পড়াতে বসানো মানেই লো প্রেশারকে হাই করানো। তারপরই স্কেল দিয়ে পেটানো। পেটাপেটি একটা

পর্যায়ে ছেলের গর্ভধারিণীর আবির্ভাব। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের কালে মাসিরা আশকারা দিয়ে ছেলেদের বারোটা বাজাতেন। এখনকার কালে মায়েরা। 'স্পেয়ার দি রড স্পয়েল দি চাইল্ড।'—আজকের কথা নাকি? চিরকালের সত্য। ছেলের মার সঙ্গে হাতাহাতি। তিনি স্কেলটি কেড়ে নিতে চান। আহা বাছা আমার, গোমূর্খ হয়ে চিরকাল বাপের হোটেলে থাক। বাপ যখন, বাপবাপ করে ভরণপোষণ করতে বাধ্য। ছেলে পড়ে রইল মাঝ মাঠে ফুটবলের মতো। গোলের কাছে স্বামী-স্ত্রীতে স্কেল নিয়ে ড্রিবলিং। একটু চেঁচামেচি— খবরদার, খবরদার। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার দিকের জানালায় একটি মুখ—'কী হল দাদা?'

এই 'কী হল দাদা'-দের জন্যে কোনো কিছুই চেপে রাখার, লুকিয়ে রাখার উপায় নেই। সব সময় আমরা পাদপ্রদীপের সামনে। সবাই জেনে গেছেন, যে স্ত্রীর সঙ্গে সাতসকালে স্কেল-যুদ্ধ হয়, সেই স্ত্রী সন্ধেবেলা আদর করে মুখে রসগোল্লা দেন।

জগন্নাথ তেড়ে উঠলেন, থামুন আপনি, দেশের এই হালের জন্য দায়ী কংগ্রেস।

বিশ্বনাথ বললেন, আজ্ঞে না, দায়ী অপদার্থ লেফটফ্রন্ট! জগা, তোর মগজ ধোলাই হয়ে গেছে।

মুখ সামলে বিশুদা, আমার নাম জগা নয়, জগন্নাথ।

শ্বশুরমশাই বললেন, আচ্ছা জ্বালা রে বাবা। অন্ধকারে শুরু হল শুম্ভ-নিশুম্ভের লড়াই। হ্যাঁ গা, তোমার সেই বিখ্যাত চালভাজা দু' বাটি দিয়ে যাও তো। এরা মুখটাকে অন্যভাবে ব্যস্ত রাখুক।

দুই মেয়ে বললেন, দুটোকেই বাইরে বের করে দাও, বাবা।

এবারে তাই আলাদা ব্যবস্থা। দু'জনে দু'ঘরে বসবেন। রাজনীতির অবস্থা আরো ঘোলাটে হয়েছে। লাশ না পড়ে যায়! ষষ্ঠীর দিন মেয়ে না বিধবা হয়।

পরেশবাবু সন্দেশ খেতে সাহস পাচ্ছেন না। গতবারের কথা মনে পড়ছে। সন্দেশে সাতদিন ন্যাপথালিনের ঢেঁকুর ছেড়েছিল। শাশুড়ি ঠাকরুণ দেরাজে রেখেছিলেন। ছোট মেয়ের বিয়েতে বেশ কিছু বেঁচেছিল, মাল স্টোর করা ছিল ষষ্ঠীর জন্যে। হাত একটু এগোয়, আবার পেছিয়ে আসে।

শাশুড়ি ঠাকরুণ হাসি হাসি মুখে বলতে থাকেন, কী হল, খেয়ে নাও বাবা, খেয়ে নাও বাবা।

জামাই শেষে লজ্জার মাথা খেয়ে বলেন, ন্যাপথালিন আমার পেটে সহ্য হয় না, মা।

প্রশ্নোত্তরে দুর্গোৎসব

দুর্গাপুজোর সবচেয়ে বড় আতঙ্ক বিজয়া দশমী। দশমী বাদ দিয়ে যদি পুজো হত, তাহলে মন্দ হত না। অর্থাৎ মা আসবেন, মা যাবেন না। নবমী পর্যন্ত এসে মাইকেলের প্রার্থনা : 'যেও না নবমী নিশি, লয়ে তার দলে', শুনে মা আমাদের দোলাই হোক, গজই হোক আর নৌকোই হোক, তার বাহক/মাহুত/মাঝিদের ডেকে বলবেন, পুজো কমিটির পাণ্ডাদের খুঁজে বের করে, ভাড়া বুঝে নিয়ে সোজা চলে যাও, আমি আর ফিরছি না। আমার হিমালয়ান কিংডামে গিয়ে বলে দাও, বছরে একবার এসে চারদিন থাকলে, সামলানো যাবে না। এ দেশ আর সে দেশ নেই। কেস সিরিয়াস। লাগাতার মহিষাসুর মারতে হবে। ডেলি অন্তত এক ডজন করে। অসুরের প্রভাব টেরিফিক বেড়ে গেছে। সুরা সেবন করে, জিনস্ পরে দেশ কাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে। কোথায় লাগে আমার মহেশ্বরের নন্দী-ভৃঙ্গী।

মাতা দুর্গাদেবী এমন সিদ্ধান্ত নিলে, আমরা যারা না অসুর না দেবতা, একত্রে একটি নতুন শব্দ 'নাসুরনাদেব', তারা দু'হাত তুলে নৃত্য করব আর বলব জয় মা, জয় মা। কারণ?

প্রথম কারণ, বিভিন্ন বাহনে মায়ের আগমন আর গমনে নানা রকম দুর্যোগের সম্ভাবনা। হোক বা না হোক, মানুষ বড় দুশ্চিন্তায় থাকে। আমরা এক অদ্ভুত জিনিস। আমরা হলুম প্রিমিটিভ মডার্ন। মানে সোনার পাথর বাটি বা কাঁঠালের আমসত্ত্ব। ঈশ্বর হয়তো মানি না। সাজে পোশাকে আহারে বিহারে আচারে আচরণে, অ্যাংলো-অ্যামেরিকান-অস্ট্রাল-হাঙরো-রাশিয়ানো-জার্মান। সিন্নি খাই, শূকর খাই, অশৌচ অবস্থায় হবিষ্য করি, মুণ্ডিত মস্তকে চুল না গজাতেই চিকেন বা রেশমী চালাই। দীক্ষা নিয়ে মালা জপ করি, বেবিফুডে ভেজাল মেশাই। শনিবার শনিবার কালীঘাট কি দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে মা, মা করি। নিজের মাকে শুকিয়ে মারি। যুক্তি দেখাই, বিলেতের সভ্য মানুষের ধারায় : ওয়াইফ ফার্স্ট, মাদার নেকস্ট। সূর্যগ্রহণে পৃথিবী উলটে যাবে ভেবে উত্তেজনায় ছটফট করি। রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে গিয়ে হরতালের চেহারা নেয়।

অষ্টগ্রহ সম্মেলন ঠেকাতে হমন হয়, আশি মণ গব্য ঘৃত পুড়ে যায়। যাঁরা পোড়ান, অর্থানুকূল্যে আধুনিক বিজ্ঞানের সুযোগ-সুবিধে তাঁরাই নেন বেশি। স্টিরিও, কালার টিভি, ফ্রিজ, পোলারাইজড ক্যামেরা। চোখে তুলসীপাতা স্পর্শ

করিয়ে ভিডিও ক্যাসেটে বিদেশী নগ্ন শরীর দেখেন। স্কচ খান, এর্ক চিমটে গঙ্গামাটি ফেলে। 'রামজী-কি জয়' বলে, তেলে মবিল মিশিয়ে এক নম্বর খাঁটি সরষের তেল বানান। 'হোঁরুমানজী কি জয়' বলে, বিদেশের মাল চোরাপথে স্বদেশে, স্বদেশের মাল বিদেশে পাচার করেন। হুমনে অগ্নি মগ ঘেঁউ পোড়াতে কষ্ট হয় না। বুক ফেটে যায় কর্মচারীদের মাইনে দিতে। দেড়শো টাকায় একজন খেটে চলেছে সকাল আটটা থেকে রাত দশটা। মানুষ মারো, মুনাফা লোটো, তুলসী রামায়ণ পড়ো, জনসেবার প্রতিষ্ঠান করে দেশের দরিদ্রদের ম্যালনিউট্রিশান দূর করার নামে বিদেশ থেকে সাহায্যের গুড়ো দুধ ব্ল্যাকে ঝেড়ে দাও। ফ্লাডের কম্বল ফ্ল্যাটে তুলে দাও। মাঝরাতে পার্ক স্ট্রিটের বার-এ দুশো টাকা টিপ্‌স মেজাজে 'লে যাও' বলে, কুকুরের মুখের ডগ বিস্কুটের মত তুলে দাও। আর কারখানায় সেফটি-রুলস না মানার জন্যে, না রাখার জন্যে যে শ্রমিকের হাত, পা, কি চোখ গেল, তার কমপেনসেশানের টাকা মারার জন্যে ব্যারিস্টারের পেছনে তিন হাজার ঢালো। এ দেশে জীবনের দাম সরকারী অ্যাসেসমেন্ট অনুসারে পাঁচশো টাকা। কী করে বললুম। ট্রেন দুর্ঘটনার পর মৃতের আত্মীয়ের হাতে ওই রকমই একটা অঙ্ক তুলে দেওয়া হয়, পাঁচশো থেকে হাজারের মধ্যে। বিমানে একটু বেশি। মানুষ দেখতে এক, ভোটের হিসেবেও মূল্য এক। ওয়ান ম্যান ওয়ান ভোট, কিন্তু অন্য সব ব্যাপারেই এক-এক জনের এক-এক রকম দাম। যেন কাপ ডিশ, কাঁচের গেলাস ফুটপাতে শুয়েছিল, মাঝ রাতে মাতাল ট্রাকে-ড্রাইভার পিষে দিয়ে গেল। যেন ব্যাঙ চেপটে গেছে। নো কমপেনসেশান। ও জীবনের কোনও দাম নেই। স্টাফড্ ম্যান হলো ম্যান। বিমান দুর্ঘটনায় মৃত, তাঁর দাম অনেক বেশি। মানুষে মানুষে কত তফাত? কেউ বোন-চায়না, কেউ পোর্সিলেন, কেউ ভাঁড়। কারুর ঠোঁটে সোনালী বর্ডার গায়ে ফুল। কেউ শুধুই কাজ-চলা গোছের একটি পাত্র। চায়ের দোকানের নর্দমার সামনে যখন পাঁক তোলে, তখন উঠে আসে রাশি রাশি ছুঁড়ে ফেলা ভাঁড়। দেশের শতকরা সত্তর ভাগই এই ভাঁড়।

মায়ের যদি কথা বলার ক্ষমতা থাকত, দশভুজার দশটি হাত যদি সচল হত, তা হলে প্রথমেই শুরু করতেন ভক্ত নিধন। প্রশ্ন করতেন, আমাকে কি তোমরা পুতুল ভেবেছ? রাংতা আর সাটিন জড়িয়ে নিজেদের খুশিমত পোজে চারদিন খাড়া করে রেখে হল্লোড় হচ্ছে। প্যাণ্ডেলে বাহার দিতে গিয়ে হাজার হাজার টাকার শ্রাদ্ধ হচ্ছে। ওদিকে শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভূতের নৃত্য। সেরা কলেজের প্রাঙ্গণে দারুসেবী অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের

বেলেল্লাপনা। ছাত্রীদের দিকে অশ্লীল ইঙ্গিত ছুঁড়ে মারা। ছাত্রদের সাধনা ছেড়ে পারস্পরিক রাজনৈতিক কোঁদল। দলাদলি হানাহানি। নেতৃস্থানীয়দের জাগ্রত নিদ্রা। দেশের ভবিষ্যৎ যাঁরা, তাঁরা এখন দাবার ছকের বোড়ে। তোমাদের এই পুজো, তমসাচ্ছন্ন মানুষের অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন উল্লাস।

খুব বাঁচা বেঁচে গেছি আমরা, মৃন্ময়ী তো ভাষাহীনা, জড়প্রতিমা। তিনি সবাক হলে প্রশ্ন করতে পারতেন, তোমাদের হাসপাতালে আজকাল চোলাই তৈরি হয়, সেবিকারা ধর্ষিতা হয়, রুগিরা যত্ন পায় না, ওয়ার্ডে কুকুর ঘোরে, মাঝরাতে ইঁদুরে পায়ের আঙুল কুরে কুরে খেয়ে যায়, খাদ্য ও ওষুধ চোরাপথে চাইলে ক্লাস ফোরের দোহাই পাড়া হয়। কেন তোমাদের এই অবস্থা! ধর্মের দেশ। তাই না? বারো মাসে তেরো পার্বণের স্রোত বইছে। কেন এই পুজো? কার পুজো? শক্তির, না তামসিকতার!

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন রবীন্দ্রনাথঃ

'তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি। বুঝতে নারি কখন তুমি দাও যে ফাঁকি।'

দেবী যদি আবার প্রশ্ন করেন, তোমাদের সবই কেন এত হাস্যকর ছল চাতুরিতে ভরা, সাপও মরে না, লাঠিও ভাঙে না। যেমন পথ-নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন। গোটা কতক ব্যানার, চটকদার স্লোগান, একটি লাউড স্পিকার, উদ্যত-হস্ত পথ-পুলিশ, কিছু সেবক-সেবিকা, সাতদিনের লোক দেখানো, লোক ঠকানো পথ-নাটিকা। হকারদের ঠেঙিয়ে বিদায়। তারপর আবার পুনর্মূষিক ভব। কুকুরের বাঁকা ন্যাজ আবার বেঁকে যায়। কী বিচিত্র সরলীকরণ পদ্ধতি! সাতদিনের তামাসা। এক সপ্তাহ শৃঙ্খলা, একান্ন সপ্তাহ চরম বিশৃঙ্খলা।

শিশু-সপ্তাহে সাত দিন শিশু হয়তো প্রোটিন মাখানো সেবাসংস্থার বিস্কুট আর গুড়ো দুধ গোলা খাবে, আর বাকি তিনশো আটান্ন দিন অর্ধাহারে, অনাহারে থাকবে। কেন? তোমাদের এমন কোনও পরিকল্পনা নেই, যাতে সব শিশুই একদিন সুস্থ নাগরিক হয়ে উঠতে পারে। সকলেই জীবনযাত্রার একটা সুস্থ মান-এ পৌঁছতে পারে। স্বাধীনতা তো অনেক বছর ভোগ করলে। তবু দুর্ভোগ তো ঘুচলো না। যে তিমিরে সেই তিমিরেই পড়ে রইলে।

দেবী, এর উত্তরে আমার মাথা চুলকাবো আর মাইকের মুখটা তোমার দিকে ঘুরিয়ে দোব।

প্রশ্ন শেষ হয়নি। তোমাদের শহরের সিনেমা হলে স্লাইড পড়ে ঃ শহরকে জঞ্জালমুক্ত রাখুন, পরিষ্কার রাখুন, সুন্দর করে তুলুন। আমি বসে আছি

আঁস্তাকুড়ে। কার দায় পড়েছে, শহর পরিষ্কার রাখার। আমি তো প্রতি বছরেই চারদিনের জন্যে আসি। এসে দেখি আর অবাক হয়ে যাই। তোমাদের একটি পরিকল্পনার বিস্ময়কর অগ্রগতি, কাজ না করার আর ভাগাড় বাড়িয়ে চলার। ভাগাড়ের কী শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে বাছা। ওই তো আলোর মালা ঝুলিয়েছে, টালা থেকে টালিগঞ্জ, শহর যেন ডাইনীর মত দাঁত বের করে হাসছে।

দেবী। এর উত্তর হল, কিনু গোয়ালার গলিকে আমরা ভুলতে চাই না, আমাদের গর্ব। পড়বো আর মেলাবো :

বর্ষা ঘন ঘোর।
ট্রামের খরচ বাড়ে
মাঝে মাঝে মাইনেও কাটা যায়
গলিটার কোণে কোণে
জমে ওঠে পচে ওঠে
আমের খোসা ও আঁটি, কাঁঠালের ভুতি
মাছের কানকো
মরা বেড়ালের ছানা
ছাইপাঁশ আরো কত কী-যে।

মাতা দুর্গা, তুমি আর প্রশ্ন কোরো না মা। আমরা সব পড়া না করে আসা স্কুলের ছাত্র। কোন প্রশ্নেরই উত্তর জানা নেই। জানি, তুমি এবার প্রশ্ন করবে, তোমাদের সব পরিকল্পনাই বানচাল হয়ে গেল কেন। সেচ পরিকল্পনায় কোটি কোটি, অর্বুদ অবুদ টাকা খরচ হয়ে গেল, তবু তোমার খরায় শুকিয়ে মরো, ঝরায় ডুবে মরো। কেন বাছা?

মা, পরিকল্পনা যে উঠে গেছে। কাঁপে লাঠি পড়ে গেছে। সব ড্যাম তৈরি হয়নি।

তোমাদের ঘরে সন্ধের বাতি জ্বলে না কেন বাছা!

সে মা, অনেক স্টোরি। মন্ত্রীদের নম্বরী বক্তৃতার মত। আজ টিউব লিক, কাল কয়লা ভিজে, পরশু টিউব লিক, তরশু কয়লা ভিজে—আমরা ঠিক জানি না মা। দুষ্ট সমালোচক বলেন, রাজনীতি। দেশ জুড়ে গদির লড়াই চলেছে মা, তোমার মহিষাসুর মা অনেক নিরীহ প্রাণী। এই গদি-অসুর, (সন্ধি করে গদ্যাসুর) -দের জ্বালায় প্রাণ যায় মা। চামুণ্ডাবাহিনী ছেড়ে দিয়েছে, এ পাড়ায় ও পাড়ায় বোমাবৃষ্টি চলেছে। সারা রাত চলেছে মরণের উৎসব। উপদ্রুত এলাকায় পুলিস যেমন চেক-পোস্ট বসায়, তুমিও মা তেমনি চেক পোস্ট বসিয়ে বেশ কিছুদিন

থেকে যাও।

বাছা, আমি হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করছি, সিমিলি সিমিলিবাস, বিষে বিষে, বিষক্ষয়। অসুর দিয়ে নিধন। বিগ পাওয়ারেরা কী করছে, দেখছ না? ছোটে ছোটে দুটো দেশকে লড়িয়ে দিয়ে, এক পাশে বসে বসে মৃদু মৃদু হাসছে, এটা ওটা সাপ্লাই দিচ্ছে, ধ্বংসের চিতায় ঘৃতাহুতি। সব শেষ হলে আবার শুরু হবে। এখন অসুরে অসুরে ফাটাফাটি চলুক।

ইতিহাস ফিরে ফিরে আসে, যুগসন্ধির এই লক্ষণ। স্যাঁতসেঁতে মানুষের দল কীকরে চলেছে। নিজেরাই জানে না। ঢাউস প্যান্ডেলে অপশক্তির বোধন চলেছে। বাসে ট্রামে বাজারে প্রতিদিন আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়। পরস্পরকে দাঁত খিঁচিয়ে চলেছি। দুই বাঙালীর দেখা মানেই হয় তৃতীয় আর এক বাঙালীর ছিদ্র অনুসন্ধান, না হয় নিজেদের মধ্যেই ঠুসঠাস। অথচ বিজয়ার দিন এরাই বেরোবেন নেচে নেচে। দেহের কোলাকুলি হবে, মনের কোলাকুলি হবে না। ও বস্তু বাঙালীর কোষ্ঠীতে লেখা নেই।

তারপর প্লেটে প্লেটে নেমে আসবে সেই সব আতঙ্ক। কুড়ুল কাটা বনস্পতিতে ভাজা সাংঘাতিক নিমকি। অসুরকে তোমার ক্যাঁচার খোঁচা না মেরে এই নিমকি গোটা দুই খাওয়ালেই লটকে পড়বে। আসবে ঘুগনি। যেন আমেরিকার। ক্লাস্টারবম্ব, মটর প্যাট প্যাট করে চেয়ে আছে, অসংখ্য মৃত-মাস্তানের চোখের মত। দাঁত বের করে আছে নারকেল কুঁচি, গুড়ো হলুদে কেউ তীব্র হলদে, লঙ্কার দাপটে কোনও স্যাম্পল জবা-লাল। কেউ আবার প্রেশারে ছেড়েছেন, গলে পাঁক। কোনওটি চাটনির মত মিষ্টি, কোনওটি ব্রহ্মতালু ভেদকারী প্রচণ্ড ঝাল, প্রাতঃস্মরণীয়। যাবার বেলায় এ যেন তোমার ঝাড়া লাথি। তুমি থেকে যাও, মা।

ফাবেডিরু

রাজ্যের নাম ভঙ্গ। রাজধানীর নাম কালীগোলা। আগে কালীতে ঈ লাগানো হত। নতুন আইনে ধর্ম বিদায় হওয়ার পর কালী হয়েছে কালি। অর্থাৎ কালো। রাজধানীর রাজবাড়ির একটি ঘর। সেই ঘরে দশাসই একজন মানুষ বিশাল একটা টেবিল সামনে নিয়ে বসে আছেন চেয়ারে। সে-চেয়ার ঘোরে। সামনে-পেছনে দোল খায়। ডানপাশে হাতের কাছে তিন চারটে বিভিন্ন রঙের টেলিফোন। সাপ ব্যাঙ ধরলে যেমন আওয়াজ হয় কোনও একটা টেলিফোনে সেইরকম আওয়াজ হল। ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে টেলিফোন তুললেন। ভদ্রলোক হলেন রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তরের সচিব।

সচিব : হ্যালো। পাওয়ার। হ্যাঁ, পাওয়ার সেক্রেটারি। আপনি? অ নিউজপেপার। বলুন কি ভাবে খোঁচাতে চান? আই মিন ঠোকরাতে!

সাংবাদিক : সব তো অচল হয়ে বসে আছে মশাই। ট্রেন, ট্রাম, স্কুল, কোর্ট, কাছারি। আজকের ব্যাপোটা কি?

সচিব : আপনাদের কাছে তো একটা লিস্ট দেওয়া আছে। আমার, আপনার দু'জনেরই সময় নষ্ট না করে যে-কোনো একটা লাগিয়ে দিন না। পাওয়ার নিয়ে এখন কে আর মাথা ঘামায় আপনারা ছাড়া। আছে আছে, না আছে না আছে। কাগজের খনিকটা জায়গা ভরাতে চান। এই তো!

সাংবাদিক : আজ তো মনে হচ্ছে বেশ বড় রকমের মাইফেল। কারণটা আপনার মুখ থেকে এলে একটা ভ্যারাইটি পাওয়া যেত।

সচিব : লিস্টে যতরকম ভ্যারাইটি হতে পারে সবই দেওয়া আছে। আর কিছু বাকি নেই। কী বললেন, ঠিক ধরতে পারছেন না। এক কাজ করুন, ব্রেইল পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করুন।

সাংবাদিক : সেটা কি?

সচিব : চোখ বুজিয়ে লিস্টে হাত রাখুন, আই মিন আঙুল রাখুন। চোখ খুলে দেখুন কোথায় পড়ল, সেইটাই কারণ। আমি ধরে আছি। করে বলুন কারণটা কি পেলেন! আমারও সাহায্য হবে। প্রেস হ্যান্ডআউটে সেইটাই দিয়ে দেবো।

সাংবাদিক : জাস্ট এ মিনিট, লিস্টটা বের করি।

সচিব কানে ফোন লাগিয়ে গুনগুন করে গান গাইতে লাগলেন।

'তারা দিয়ে সাজিও না আমার এ রাত, আঁধার কেন ভাল লাগে!'

সাংবাদিক : হ্যালো।

সচিব : কী কারণ।

সাংবাদিক : মাছি।

সচিব : হোয়াট? মাছি। মাছি তো লিস্টে ছিল না। মাছির সঙ্গে তো রসগোল্লার সম্পর্ক! পাওয়ারের সঙ্গে তো মাছির কোনও সম্পর্ক নেই। মাছি ইরিটেট করে গরুকে, মানুষকে। গরু লেজের ঝাপটা মারে, মানুষ হাতের। স্ট্রেঞ্জ!

সাংবাদিক : লিস্টের একটা জায়গায় কি ভাবে মরে চেপ্টে ছিল! আঙুল সেইখানেই গিয়ে পড়ল।

সচিব : ঠিক আছে। পড়েছে যখন, লেট আস অনার দ্যাট মাছি। লিখুন, হাইটেনসান ডিস্ট্রিবিউশান লাইনে মাছি বসায় প্ল্যান্ট ট্রিপ করেছে।

সাংবাদিক : ছোট্ট একটা মাছি এত বড় একটা কাণ্ড করতে পারে? গাঁজাখুরি শোনাবে না?

সচিব : বেশ, মাছিটার সাইজ বাড়িয়ে দিন। লিখুন কাবুলী মাছি।

সাংবাদিক : কাবুলী মাছি? সে আবার কি? মাছির নতুন ভ্যারাইটি!

সচিব : ধ্যার মশাই! আপনাদের সবেতেই প্রশ্ন! ইউ আর অল কোয়েশ্চেনস অ্যান্ড নো অ্যানসারস। প্রশ্নকারী-সাংবাদিক না হয়ে উত্তরদাতা হওয়া চেষ্টা করুন না। সেল্‌ফ হেল্প ইজ বেস্ট হেল্প, এক নম্বর উপদেশ। দু'নম্বর, গড হেল্প দোজ হু হেল্প দেমসেল্‌ভস। নিজের মাথা খাটান। ডোন্ট ডিপেন্ড অন আদারস মাথা।

সাংবাদিক : ধ্যার মশাই! ধ্যারধেড়িয়ে বকেই চলেছেন। কাবুলী মাছিটা কী বলবেন তো।

সচিব : কাবুলী ছোলা যদি হয় কাবুলী মাছি কেন হবে না! বড় সাইজের মাছি।

সাংবাদিক : মাছি যত বড়ই হোক, কত বড় হবে? হনুমানের মতো! হিপোপটেমাসের মতো!

সচিব : সাইজ নিয়ে মাথা খারাপ করছেন কেন? এ ফ্লাই ইন এ বট্‌ল। এক বালতি দুধে ওয়ান মাছি ইজ এনাফ। পঞ্চতন্ত্রের গল্প পড়া আছে?

সাংবাদিক : না। আমি ইংলিশ মিডিয়াম।

সচিব : ওই জন্যেই এই হাল। নলেজ ব্যাঙ্ক নিল। কপি তৈরি হবে কি করে! ডু ইউ নো, একটা মাছি এক রাজার মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। রাজা, রাজত্ব, পাওয়ার প্ল্যান্ট। খোদ রাজাকেই মরতে হল মাছির জন্যে, পাওয়ার প্ল্যান্ট তো কথা। তুচ্ছ একটা জিনিস। রাজা বিশ্রাম নেবেন কুঞ্জে। ক্লান্ত রাজা। বন্ধু বানরকে বললেন, লুক মাই ফ্রেন্ড, এই আমি চিৎপাত হলুম কিছুক্ষণের জন্যে, তুমি পাশে বসে, পাহারা দাও। কেউ যেন ডিস্টার্ব না করে। রাজা স্লিপিং। বাঁদর সিটিং। অ্যান্ড এন্টারড এ মাছি। রাজার মুখের চারপাশে ভনভন করে উড়তে লাগল। বাঁদর প্রথমে চেষ্টা করল ঝাপটা মেরে তাড়াতে। মাছির মতো ন্যাগিং প্রাণী আর দ্বিতীয় আছে! জাস্ট লাইক সাংবাদিকস।

সাংবাদিক : আই প্রোটেস্ট।

সচিব : পরে, পরে। আগে শুনে নিন। যে গরু দুধ দেয় তার চাঁটও সহ্য করতে হয়। সেট্‌ল অন মাছি। মাছি রাজার কপালে বসছে, নাকে বসছে, চোখের পাতায় বসছে। বাঁদর ভীষণ রেগে গেল। পাশেই পড়েছিল রাজার খাপ খোলা তরোয়াল। মাছি কপালে বসে তির তির করছে। তরোয়ালের এক কোপ, ব্রাভি মাছি। মাছি উড়ে গেল, রাজার মাথা দু-খণ্ড। রাজা চলে গেলেন তাঁর হেভন্‌লি অ্যাবোডে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, মাছি ক্ষুদ্র হলেও ভয়ঙ্কর।

সাংবাদিক : সবই বুঝলুম, তবে শুধু মাছি হলে তো চলবে না। কেস দাঁড়াতে হলে একটা বাঁদরও চাই।

সচিব : আরে মশাই বাঁদরের অভাব আছে দেশে! একটা জোগাড় করে নিতে কতক্ষণ। যে কোনও সাহিত্যিক কেসটাকে কল্পনা দিয়ে সহজেই সাজিয়ে নিতে পারতেন। আপনার ইমেজিনেশন নেই। লিখে দিন, হেলিকপ্টারে করে বন্যাত্রাণের জন্যে গুড় আর ছাতু যাচ্ছিল। হেলিকপ্টার লিক করে তারের ওপর গুড় পড়ল। সেই

গুড়ের লোভে কাবুলি মাছি এল। শর্ট সার্কিট হয়ে ফিউজ উড়ে গেল। রাজ্য তলিয়ে গেল অন্ধকারে। কি? পছন্দ হল স্টোরিটা?

সাংবাদিক : কাবুলী মাছি কি কাবুল থেকে এল?

সচিব : ধুর মশাই। ইউরিয়া সারে এক একটা বেগুনের সাইজ বেলুনের মতো। মুলো যেন মুগুর। এই দিশি মাছিই সার পেয়ে কাবলে মাছি হয়েছে।

সাংবাদিক : এই স্টোরিতে পাবলিক হাসবে।

সচিব : আরে মশাই এত দুঃখেও মানুষকে যদি একটু হাসাতে পারেন, তাহলে তো কথাই নেই। এক মহাসাফল্য। অন্ধকারে অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে, এই গানের আর কোনও অর্থই থাকবে না। অন্ধকারে অন্তরেতে হাসি ওঠে গুমরে গুমরে। বাঃ! সচিব ফোন ফেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ফোন ক্যাঁক করে উঠল।

সচিব : হ্যালো! পাওয়ার।

মন্ত্রী : আর পাওয়ার পাওয়ার করবেন না। সিকস্টিন আওয়ারস স্টেট পাওয়ারলেস। একটা কিছু না করলে হাতে তো হ্যারিকেন!

সচিব : ইয়েস স্যার।

মন্ত্রী : কোনটায় ইয়েস মারলেন? হারিকেনে না পাওয়ারে?

সচিব : ও দুটোর কোনওটাতেই নয় স্যার। এটা আমাদের মুদ্রাদোষ। পাওয়ারকে আমরা ইয়েস স্যার বলি। আপনি সেই পাওয়ার।

মন্ত্রী : ছি ছি, লজ্জা! মরি, এ কি দুস্তর লজ্জা। এ পাওয়ারে কল চলে না, আরো জ্বলে না।

সচিব : কেন নিজেকে ছোট করছেন স্যার! শোনেননি, আপনারে ছোট বলে ছোট সেই নয়। লোকে যারে ছোট বলে ছোট সেই হয়।

মন্ত্রী : কী বলছেন যা তা। ছেলেবেলায় আমরা পড়েছি, আপনারে বড় বলে বড় সেই নয়...

সচিব : কেন পড়েননি, বড় যদি হতে চাও, ছোট হও তবে। তার মানে ছোট হওয়াটাই বড় হওয়া। যেমন ছোটলোক হলে বড়লোক হয়।

মন্ত্রী : চলে আসুন আমার চেম্বারে। ভাগ্য ভাল সি এম আজকাল স্টেটে খুব কমই থাকেন। থাকলে দাবড়াতেন।

সচিব : কখনওই নয়। তিনি দাবড়ান কেন্দ্রকে আর রিপোর্টারদের।

পাওয়ারের ব্যাপারে আমাদের কিছুই করার নেই। বেশি পাওয়ার মানে ঔদ্ধত্য। অন্ধকার হল, ইকোয়ালিটি, ইটার্নিটি, ফ্রেটারনিটি। অন্ধকার হাতড়ে মরে ধনী, গরিব, হাজার লোকে।

মন্ত্রী সাহিত্য না করে চলে আসুন।

॥ ২ ॥

পাওয়ার মিনিস্টারের ঘর। চেয়ারের পেছনে বিশাল চার্ট। চার্টের তলার মেঝেতে একটা গর্ত। সবাই প্রশ্ন করেন গর্ত কেন? পাওয়ার জেনারেশন কার্ভ ওপরের দিকে না উঠে ক্রমশই নীচে নামছে। তিন তলা থেকে দোতলা। দোতলায় ইন্ডাস্ট্রি মিনিস্টার। তাঁর চেয়ারের পেছনে একটা বোর্ড। পাওয়ার কার্ভ সেই বোর্ডের কোণ ছুঁয়ে নামছে। সেখানে আরো একটা লাইন তার সঙ্গী। সেটা হল ক্লোজারের লাইন। দুটো গলা জড়াজড়ি করে একতলায় নেমে গেছে। সেই ঘরটা হল হল্লা হল। স্লোগান ফ্যাক্টরি। সেখানে বোর্ড নেই। একটা ডাণ্ডা মাথায় একটা ঝাণ্ডা। রাগী চেহারার কিছু ভদ্রলোক। হাত মুঠো করছেন, হাত খুলছেন। যেন কোনও অদৃশ্য শত্রুর চুলের মুঠি ধরে ছিঁড়ছেন। এই ঘরেই একটা টেবিলে আন্তর্জাতিক ভাবনা দপ্তর। সেখানে একটা স্টিকারে লেখা আছে, 'দেশকে তুচ্ছ করে বিশ্বের কথা ভাবতে শিখুন। সমাজতন্ত্রের মাথায় ধনতন্ত্রের টুপি চাপান। গরিব কখনো বড়লোক হয় না। বড়লোকই আরো বড়লোক হয়। সোনার পাথরবাটি অবাস্তব ব্যাপার। দেশের মানুষকে বক্তৃতা সেবন করান। বায়ুর মতো পথ্য নেই। দারিদ্র্যের মতো শৃঙ্খল নেই। ভেড়ার গায়ের লোমেই বড়লোকের জামিয়ার হয়। মরার যারা মরবে। বাঁচার যার বাঁচবে। গরুর দুধ গরু খায় না। দেবতার নৈবেদ্য পুরোহিতের প্রাপ্য। ভালবেসে ঠেঙাও। ডাণ্ডাই হল শাসন। ধোলাই একটাই। একমাত্র ধোলাই মগজ-ধোলাই। কাজের চেয়ে কথা বড়। ভালবাসা হল হোমিওপ্যাথিক গুলি। ভয় হল অ্যান্টিবায়োটিক দাওয়াই।' ইত্যাদি বহু কথা নানা অক্ষরে লেখা।

আর একটি টেবিল হল প্রোগ্রাম টেবিল। সেখানে তৈরি হচ্ছে আন্দোলন পঞ্জিকা। আন্দোলন নির্ঘণ্ট। সিদ্ধান্ত হয়েছে ছোট, পকেটসাইজ পঞ্জিকার আকারে ছেপে বিক্রি করা হবে। মলাটে লেখা থাকবে মটো, সচলের উল্টো অচল। চললেই ক্লান্তি, অচলেই এনার্জি। সচলের অচল হওয়ার ভয় থাকে। বসার পরই শোয়ার বাসনা জাগে। বন্ধুগণ শুয়ে পড়ুন। না শুলে শুইয়ে দেওয়া

হবে। সে ব্যবস্থা আছে। দ্বিতীয় মটো, কেন কাজ করবেন? কলুর বলদ হয়ে লাভ কি। যা উৎপাদন করবেন তা তো অন্যের ভোগেই যাবে। মালিক মারবে স্কচ, চিকেন আপনাদের শুকনো রুটি। এই চক্রান্ত চলছে, চলবে। চক্রান্তের চাকায় তেল না ঢেলে, হাত গুটিয়ে উবু হয়ে বসে থাকুন। তাস খেলুন। তাস-পাশা-দাবা দিন বড় নেশা। শিল্প মানেই শিল্পপতি, চাষবাস মানেই জোতদার। অতএব এও নেই ওও নেই। পণ্য কিনতে হয় মূল্য দিয়ে। মূল্য মানেই মূল্যবৃদ্ধি। মূল্যবৃদ্ধি মানেই গণ-বিক্ষোভ। পণ্য না থাকলে কোনওটাই নেই। ধর্মের যেমন ব্রহ্মবাদ, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতির ব্রহ্মবাদ আমরা খুঁজে পেয়েছি। সেটা হল, কিছুই নেই। সব শূন্য। সব ভোঁ ভোঁ। শুধু পেটটাই সত্য। পোঁ ধরলে বাঁচবে। অন্য কিছু ধরতে চাইলেই মরবে। লেজই সব। নাড়লে গুঁড়ো পাবে। খাড়া করলেই ডাণ্ডা পড়বে। চির ঠাণ্ডা মেরে যাবে।

তৃতীয় নির্দেশ, বাঙালি একসময় মাছ ধরত। প্রবচন, লেখা-পড়া করিব মরিব দুঃখে, মৎস ধরিব খাইবে, সুখে। আমরা বলছি, মাছ নয়া দাদা ধরো। বলো, আমরা সবাই এক একজন, এক এক দাদার আশ্রিত। বাবার যুগ শেষ, এখন হল দাদার যুগ।

পঞ্জিকা মানে প্রোগ্রাম, যেমন ৩০ মার্চ, ইরাকে মার্কিনী আক্রমণের প্রতিবাদে, পদযাত্রা। ট্রেন, ট্রাম, বাস চলতেও পারে, নাও পারে। ১ এপ্রিল, দূতাবাসের সামনে কুশপুত্তলিকা দাহ। ১৫ এপ্রিল, বিশ্বসংহতি দিবস। বিশাল মিছিলের লাগাতার পথ-পরিক্রমা। ২৫ এপ্রিল, আফ্রিকা দিবস। মুক্তিকামী মানুষের ক্রন্দনে শহরবাসীর ক্রন্দন। ১৬ মে, বন্ধ। জনকল্যাণে সব বন্ধ রাখার জাতীয় ডাক। ২০ মে, সমাজতন্ত্রের সংরক্ষণে মানবশৃঙ্খল। ২১ মে, যুব মিছিল। ২৩ মে, প্রৌঢ় মিছিল। ২৪ মে, কলকারখানা খোলার তাগিদে ২৪ ঘণ্টা বন্ধ। ২৯ মে, শক্তি মিছিল। ১ জুন, শহরের টাকে আম জনসভা।

বিঃ দ্রঃ সব কিছু অচল হয়ে যেতে পারে। প্রসূতি পথেই প্রসব করতে পারেন। হৃদরোগীর হাসপাতালের পথ স্বর্গের পথ হতে পারে। পরীক্ষার্থীর কেন্দ্রে পৌঁছনো নিজের দায়িত্বে। দয়া করে আগুন লাগাবেন না, দমকল জল দিতে পারবে না। আত্মিক বাঁধাবেন না, অ্যাম্বুলেন্স যাবে না। যাঁরা খাবি খাচ্ছেন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে মৃত্যুকে ধরে রাখুন। বিবাহের বর কনের বাড়ির কাছে ঘাপটি মেরে বসে থাকুন। লগ্ন পেরিয়ে গেলে কেউ দায়ী হবে না। যাঁরা ট্রেন বা প্লেন ধরতে চান কুরিয়ার সার্ভিসের সাহায্য নিন।

কালবেলা : দূর্গাপুজো, কালীপুজো, সরস্বতী পুজোর আগের পনের দিন।

দরজা জানালা দেবদূতের জন্যে খোলা রাখুন। যমদূত ভেবে দুর্ব্যহার করলে ভবলীলা সাঙ্গ হতে পারে। টিভি, রেডিয়ো যা-ই বলুক না কেন, রক্তদান শিবিরে বোতলখানেক দেওয়ার মতো, স্থাবর-অস্থাবর বেচে আমাদের ছেলেদের ছপ্পর ভরে দিন। দেশ থেকে ধর্ম বিদায় হলেও বারোয়ারি পাওয়ার ফুল।

॥ ৩ ॥

[মন্ত্রীর ঘর। সচিব আর মন্ত্রী মুখোমুখি। শিল্পসচিব ঘুর ঢুকছেন। নাম বিমল বসু। সবাই বলেন এ শর্ট অফ বসু। টুকটুকে আদুরে চেহারা। বড়োলোকের ছেলে। তিনি চেয়ার নিতে নিতে বলছেন—]

শিল্পসচিব : এ শর্ট অফ হেভি শর্টফল। এ শর্ট অফ কেঅস।

মন্ত্রী : আমি আমাদের তিন এক্সপার্টকে ডেকেছি। একটা কমিটি না করলে এ-সমস্যার সমাধান নেই। হোয়াট ও সিচ্যুয়েসান।

শিল্পসচিব : এ শর্ট অফ ডেকৃসিং প্রবলেম। ক্রনিক ডিজঅর্ডার। এ শর্ট অফ সাবোতাজ। ইনডাস্ট্রি তো গেল। উইদাউট পাওয়ার প্রোডাকসান তো নিল হয়ে গেল। আপনার বোর্ডের ওই পাওয়ার জেনারেসান কার্ভ আমার ঘরের ভেতরের বোর্ডের ওপর দিয়ে ইন্ডাষ্ট্রি কার্ভের সঙ্গে গলা জড়াজড়ি করে পাতাল নেমে গেছে। ভার্চুয়ালি ইউ আর রেসপনসিব্ল ফর দ্যাট।

মন্ত্রী : বাজে কথা বলবেন না। একদম বাজে বকবেন না। আপনার কটা ইন্ডাষ্ট্রি বেঁচে আছে মশাই! নদীর এপার, ওপার মহাশ্মশান। সব তো লালবাতি জ্বেলে বসে আছে। পাওয়ারের ঘাড়ে পা তুলে দিলেই হল। রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র ফিরে এলে রুবল আসবে। স্টেডিয়ামে নাচ হবে। খাড়া ঈশ্বরের পাওয়ার প্ল্যান্ট চালু হবে। পাওয়ারের বন্যা বইবে আগামী শতাব্দীতে। আলো, আরো আলো, আলোয় আলোকময়, তখন আপনি কি করবেন?

শিল্পসচিব : দোষ কারো নয় গো মা, স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা। দায়ী ওই লেবার আর ট্রেডইউনিয়ন। আপনার পাশের ঘর। যাচ্ছে আর তালা ঝোলাচ্ছে। এ শর্ট অফ ছেলেখেলা।

মন্ত্রী : এটা ঠিক হচ্ছে না। আমরা বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে পদযাত্রা করে নিজেদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছি। আমরা

ইউনাইটেড, আমরা একটা ফ্রন্ট। আমরা আমাদের ব্যাক দেখাব কেন? সব কিছুর জন্যেই সব কিছু হচ্ছে।

[প্রায় একই রকম দেখতে তিনজন ঢুকলেন। সভ্য, ভব্য, গম্ভীর। এঁরা এক্সপার্ট। তিনজনের আসল নাম হারিয়ে গেছে, এখন যে-নামে পরিচিত তা হল, ফান্ডামেন্টাল মিত্র, ডিপ দাস, বেসিক ঘোষ। তিনজনে বসলেন।]

মন্ত্রী : একটা কিছু করতে হয়। পার্মানেন্ট। এই দু'দিন অন্তর ফুস্। আমার পাওয়ার কি দেশলাই! মোমবাতি! ভয়ঙ্কর রেগে গেছি মশাই আপনারা তিনজন ভুইং নাথিং।

[ঘরে আর একজন ঢুকলেন বেশ লম্বা চওড়া। আর এক বিশেষজ্ঞ। এঁকে সবাই ডাকেন রুট রায়।]

মন্ত্রী : আরে, আপনি আছেন? ভেবেছিলুম বিদেশে? বসুন, বসুন। কী অভিজ্ঞতা নিয়ে এলেন ওদেশ থেকে?

রুট : [বসতে বসতে] ইলেকট্রনিকস। এজ অফ ইলেকট্রনিকস। সব কর্ডলেস।

মন্ত্রী : তাতে কি পাওয়ারলেস পাওয়ার করা সম্ভব হবে।

ফান্ডামেন্টাল মিত্র : না, না, তা কি করে সম্ভব! পাওয়ারের ফান্ডামেন্টালটা কী? হোয়াট ইজ পাওয়ার!

শিল্পসচিব : এ শর্ট অফ এনার্জি। একটা শক্তি।

বেসিক ঘোষ : না না। হোয়াট ইজ দি বেসিক। বেসিকটা কী? এনার্জি পাওয়ার, না পাওয়ার এনার্জি! উদাহরণ। এগজাম্পল— আমাদের মন্ত্রীমহোদয়কে ধার যাক—পাওয়ারে আসার পর এনার্জি হল, না এনার্জি আসার পর পাওয়ারে এলেন। এই পয়েন্টটা ক্লিয়ার করতে পারলেই হয়ে গেল।

মন্ত্রী : তাহলেই পাওয়ার প্রবলেম মিটে যাবে? রাজ্য ঝলসে উঠবে?

ডিপ দাস : বিফোর দেট, আমাদের একটু ডিপে যেতে হবে। পাওয়ার আসে কোথা থেকে? জেনারেট করতে হয়। জেনারেশন ইজ দি পাওয়ার পয়েন্ট। হু জেনারেটস। ধরা যাক, মন্ত্রীমহোদয় আমাদের পাওয়ার প্ল্যান্ট। তিনি নিজেকে ঘি, দুধ, ছানা, ননি খাইয়ে পাওয়ারফুল হচ্ছেন। পাওয়ার জেনারেট করছেন।

মন্ত্রী : আই প্রোটেস্ট। ওগুলো সবই ধনতান্ত্রিক খাদ্য। আই ডোন্ট টাচ। আর টাচ করার উপায়ও নেই, সুগার, কোলেস্ট্রাল, প্রেসার...

শিল্পসচিব : ডিফিকাল্ট উচ্চারণ, ইউ শুড বি কোলেস্টেরল।

মন্ত্রী : ওই হল মশাই। সার্ভিসের এই লোকগুলোর কেবল ভুল ধরা স্বভাব। আমার খাদ্য হল গণতান্ত্রিক কাম সমাজতান্ত্রিক খাদ্য—ভাত, ডাল, রুটি, তরকারি।

ডিপ দাস : পার্টিলাইন থেকে বেরিয়ে আসুন। একটা সিরিয়াস আলোচনা হচ্ছে। দেশ ইজ ইন ডিপেস্ট ক্রাইসিস। তাপ্পি মেরে চলবে না। ঘুঁটের মতো গণদেয়ালে স্লোগান মেরেও হবে না। গণধোলাইতে মানুষ মরবে অন্ধকার ঠেকাতে পারবেন না। খাদ্য শব্দটা মিসলিডিং, মিসগিভিং, মেসম্যারাইজিং, মিসক্রিয়েটিং, মিসপ্লেসিং, মিসফায়ারিং, মিসগাইডিং, মিসরিপ্রেজেন্টিং মনে হলে, বলুন ফুয়েল। দেহযন্ত্রে ফুয়েল না দিলে পাওয়ার আসবে কোথা থেকে। সেই পাওয়ার থেকে আসবে, এনার্জি। লিম্ব এনার্জি, ভোক্যাল এনার্জি। নির্বাচনের আগে এত চেল্লাবার শক্তি আসে কোথা থেকে। তাহলে?

ফান্ডামেন্টাল

মিত্র : তাহলে সেই ফান্ডালমেন্টাল—ফুয়েল্ থেকে পাওয়ার পাওয়ার থেকে এনার্জি।

বেসিক ঘোষ : হল না, হল না। পাওয়ার আর এনার্জি এন্টায়ারলি ডিফারেন্ট। একটা মজুরেরও এনার্জি আছে, মন্ত্রীর পাওয়ার নেই। পাওয়ারের চেয়ে বড় হল পাওয়ার হাউস।

রুট রায় : রাইট ইউ আর। রুটে যান, রুটে যান। রুটস অফ পাওয়ার। এনার্জি ইজ নট পাওয়ার মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস। পাওয়ারের সোর্স কোথায়! উদাহরণ না দিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে না। ওই জন্যেই ইংরেজিতে বলে, এগজাম্পল ইজ বেটার দ্যান প্রিসেপ্ট। ধরুন একটা বাঘ শুয়ে আছে। হঠাৎ ন্যাজ নাড়তে শুরু করল। ন্যাজ নিজে নড়ে না, নাড়াতে হয়। বাঘের পাওয়ারে ন্যাজ নড়ছে। বাঘের পাওয়ার আসছে তার ফুড

এনার্জি থেকে। ফুড হল ফুয়েল। এটা একটা কেস। আবার দেখুন, একটা সাধারণ মানুষ রাস্তা দিয়ে আসছে, কিছুই না। কেউ পাত্তাই দিচ্ছে না। মন্ত্রী আসছেন, সামনে পেছনে বডিগার্ড। লোক পথ ছেড়ে দিচ্ছে। এখানে পাওয়ার হল মন্ত্রীর উপাধি। মন্ত্রীর চেয়ার। আসলে কোনও পাওয়ারই নেই, সবটাই আরোপিত। চেয়ারটা কেড়ে নিন, উপাধি খুলে নিন, ফিনিশ।

বিদ্যুত সচিব : আমরা কিন্তু ইলেকট্রিক পাওয়ারের কথা বলছি।

ডিগল দাস : না, না, ওঁকে বাঁধা দেবেন না। উনি ডেপ্‌থে যাচ্ছেন। একে বলে ইন-ডেপ্‌থ স্টাডি।

রুট রায় : একেবারে রুটে চলে যান। আমার মনে হয় একেবারে আরণ্যক কাল থেকে শুরু করা উচিত। অরণ্য, অসভ্য, বেদ, তপোবন, সভ্যতার ক্রমবিকাশ, দল, উপদল, কোন্দল, মিশর, ব্যাবিলন, রোম, গ্রিস, শক, হুন, মোগল, পাঠান, ইংরেজ উপনিবেশ, স্বাধীনতা, দেশভাগ, পপুলেশন একসপ্লোসান, পার্টি, মাল্টি পার্টি, মার্ডার অফ ইন্দিরা, রাজীব টেররিজম, সেসেসানিস্ট মুভমেন্ট, রাম জন্মভূমি, বাবরি মসজিদ, গুজরাত, লালগড় অ্যান্ড পাওয়ার।

মন্ত্রী : সর্বনাশ! কেস অ্যাতো সিরিয়াস। এ তো মশাই এক জীবনে কুলোবে না।

শর্ট অফ বসু : কুলিয়ে যাবে, কুলিয়ে যাবে। সিসটেম ইঞ্জিনিয়ারিং-এর যুগ। কম্পিউটারে ফেলে কনডেন্সড মিল্কের মতো কনডেন্স করে ফেলা হবে। দশ বালতি দুধ ছোট্ট একটা টিনে। এ শর্ট অফ প্যাড়া।

ফান্ডামেন্টাল বসু : আগে আমাদের স্টাডি করতে হবে গ্রোথ অফ সিভিলাইজেশান ম্যান অ্যান্ড মেশিন রিলেশন। মানুষ যন্ত্র চালায়, না যন্ত্র মানুষ চালায়, আর যে-মানুষ যন্ত্র চালায়, তাকে কোন মানুষ চালায়। পাওয়ার যন্ত্রের, না পাওয়ার মানুষের।

শর্ট অফ বসু : তার মানে এ শর্ট অফ জিগ স পাজ্‌ল।

রুট রায় : আমরা যদি একটু একটু করে রুটে যাই তাহলেই দেখতে পাবো...

মন্ত্রী : আপনারা কি কোনও গাছের কথা বলছেন! পাওয়ার প্ল্যান্ট মানে কি পাওয়ার গাছ!

রুট রায় অবশ্যই। কত রকমের পাওয়ার আছে জানেন? ম্যান পাওয়ার, হর্স পাওয়ার, মিলিটারি পাওয়ার, পলিটিক্যাল পাওয়ার, স্পিরিচুয়াল পাওয়ার, ডেস্ট্রাকটিভ পাওয়ার, থার্মাল পাওয়ার, হাইড্রেল পাওয়ার। পাওয়ার ক্রমশই মহীরুহের আকার নিচ্ছে। পাওয়ারের অজস্র শেকড় সভ্যতার গভীর থেকে গভীরে চলে যাচ্ছে।

ডিপ দাস : তার মানে ডিপ যাচ্ছে।

রুট রায় : তার মানে আমাদের রুটে যেতে হবে। মানুষের আবিষ্কার আজ আমাদের বাঁশ। ফ্যারাডে, গিলবার্ট, গ্রে, ফ্রাঁসোয়া দুফে, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, গ্যালভিন, ভোল্টা সবাই মিলে এই আছোলাটি আমাদের দিয়ে গেছেন। যখন বিদ্যুৎ ছিল না, তখন কি হত? এই তো মাত্র এক শতাব্দী আগের পৃথিবী। ম্যান পাওয়ার, হর্স পাওয়ার, স্টিম পাওয়ার , হাইড্রলিক পাওয়ারেই সব কজ হত। দিনে দিন, রাতে রাত। মানুষ বলত, বেলাবেলি সবকাজ সেরে নাও হে। এখানকার পৃথিবী কি তখনকার চেয়ে ভাল হতে পেরেছে! তাহলে একালের কবি কেন আক্ষেপ করে বলবেন, 'দাও ফিরে সে অরণ্য।' একই তো ব্যাপার, সভ্যতার কংক্রিট অরণ্যে মানুষই বাঘ, সিংহ, বাইসন, সাপ, গণ্ডার, দাঁতাল হাতি, হনুমান, বাঁদর, ছাগল, ভেড়া, গরু হয়েছে, খুন, জখম, লুট, ডাকাতি, ধর্ষণ-মর্ষণ কি বাকি আছে!

মন্ত্রী : আপনার রুট আর কতটা ডিপে যাবে?

রুট রায় : মাত্র একশো বছরে গেছে স্যার। এখনো তিরিশ হাজার বছর যেতে হবে। বাঁদর হল মানুষ। এ টেল অফ লং থার্টি থাউজেন্ড ইয়ারর্স।

ফান্ডামেন্টাল মিত্র : ব্যাপারটা গেঁজে যাচ্ছে। আমরা আউটলাইন হয়ে গেছি।

মন্ত্রী : সে তো গেছিই। পার্টিলাইন ছাড়া আর তো কোনও লাইন খুঁজে পাচ্ছি না।

বেসিক ঘোষ : দুঃখ করবেন না স্যার। গতস্য শোচনা নাস্তি। অনুশোচনায় অ্যাসিড হয়। অ্যাসিড টু আলসার। আলসার টু ক্যানসার। সূর্যের দিকে তাকান।

মন্ত্রী : আবার সূর্য টেনে আনলেন!

বেসিক ঘোষ : অফ কোর্স! কেন টানব না স্যার। সবচেয়ে বড় পাওয়ার হাউস। চাঁদকে চিরকাল আলো দিতে পেরেছে! পনের দিন শুক্লপক্ষ, পনের দিন কৃষ্ণপক্ষ। কামডাউন টু আর্থ। পৃথিবী সূর্যের সাবস্ক্রাইবার। চব্বিশ ঘন্টার বারো ঘন্টাই লোডশেডিং। ভোল্টেজ কমতে কমতে, ভুস। টোট্যাল অন্ধকার রোজ, নিত্য, এই একই অবস্থা। অত বড় একটা পাওয়ার হাউস গোটা পৃথিবীটাকে চব্বিশ ঘন্টা আলো দিতে পারে না। দুনিয়াটাকে নানা ফেজে ভাগ করে নিয়েছে। সূর্যের কোনও দুঃখ আছে! তার বিরুদ্ধে কোনও গণআন্দোলন চলে?

ফান্ডামেন্টাল মিত্র: একটা ফান্ডামেন্টাল পয়েন্ট পাওয়া গেল। একটা নয়, দুটোই বলা যেতে পারে। প্রথম হল, পৃথিবীকে যদি অ্যাকসিসে জ্যাম করে দেওয়া যায়। ঘোরাটা বন্ধ করে দেওয়া। পৃথিবী ঘুরবে না। তা হলে চব্বিশ ঘন্টাই দিন। মানুষ লোডশেডিং, পাওয়ার ফেলিওর বলে আর চেল্লাতে পারবে না। পরের নির্বাচনে দেখে নোবো বলে শাসাতে পারবে না।

মন্ত্রী : সে কি করে সম্ভব?

বেসিক ঘোষ : হোয়াই নট? জ্যামের বেসিকে যান। কত রকমের জ্যাম আছে? ট্রাফিক জ্যাম, ইলেকট্রিক ওয়েভ জ্যাম, ড্রেন জ্যাম, ট্রেন জ্যাম, পোস্টাল জ্যাম, স্টম্যাক ইসোফেগাস কোলন জ্যাম, ব্রেন জ্যাম। আমরা সবরকম জ্যামে স্পেসালাইজ করেছি। বিশেষত ট্রাফিক জ্যামে। শহরের একদল ট্রাক ড্রাইভারকে পৃথিবীর টপে তুলে দিন। তাদের পকেটে-কিছু পয়সা, বিড়ি দিয়ে দিন। ব্লাডার ফুল করে দিন কান্ট্রি লিকারে। সঙ্গে দিন ট্র্যাফিক কনস্টেবল। অ্যায়সা জ্যাম করে

দেবে, নট নড়ন, নট চড়ন। বনধ্‌টাকে আমরা পারফেকশানে পৌঁছে দিয়েছি স্যার। কল বন্ধ, জল বন্ধ, দুধ বন্ধ, ডাক বিলি বন্ধ। আমরা সামনে গিয়ে দাঁড়ালে গরুর দুধ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। মানুষের চিন্তাভাবনাও বন্ধ করে দিতে পেরেছি আমরা।

মন্ত্রী : আপনি শেষে বাজারী সাংবাদিকদের মতো ব্যাঙ্গের পথেই চলে গেলেন। আমাদের এই ভয়ঙ্কর ক্রাইসিসে।

বেসিক ঘোষ : সি এম থাকলে আপনার এই কথায় কী বলতেন জানেন—ক্রাইসিস! হোয়াট ক্রাইসিস! ক্রাইসিস কিছু আছে নাকি! আমি তো বিদেশে কোনও ক্রাইসিস দেখলুম না। সুন্দর জায়গা। সুন্দর আবহাওয়া। চমৎকার খাওয়া-দাওয়া। পরিষ্কার শহর, রাজপথ। আপনি বলবেন; কথাটা হচ্ছে এ-দেশ নিয়ে।

সি এম : এদেশ, এদেশ করছো কেন? এদেশ তো আর বিদেশ নয়।

আপনি : কলকারখানা সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বেকার সমস্যা!

সি এম : বন্ধ হয়ে যাচ্ছে! এখনও যাচ্ছে। সব বন্ধ হয়ে যায়নি! তা হলে কি করলেন আপনারা! আমার হাতে যে কটা দফতর আছে তার সাকসেস দেখেও শিক্ষা হল না! আমার শেষ টার্গেট, ভঙ্গদেশ নাম পালটে বঙ্গদেশ করব। আপনারা এখনো বলছেন, যাচ্ছে। সব যায়নি। বেকার? বেকার মানে? লন্ডনের বেকারদের নামে গোটা একটা রাজপথ দেখে এলুম—বেকার স্ট্রিট।

আপনি : আজ্ঞে, সে বেকার এ-বেকার নয়।

সি এম : কোন বেকার! আপনি তো দেখছি সব জানেন! সব জেনে শুনে বসে আছেন!

আপনি : বেকার মানে...

সি এম : বুঝেছি, ইংরেজি বাংলা এক করে বসে আছেন। বলতে চাইছেন, বে-Car মানে যার কার নেই। সকলের কার থাকে? আপনারা কী ভেবেছেন? দেশটাকে আমেরিকা করতে চান! ল্যাকিজ অফ ইয়াঙ্কিজ!

আপনি : আজ্ঞে, সাকার-এর উলটোটা।

সি এম	:	সাকার ! ধর্ম। ধর্মে ধরেছে! যুধিষ্ঠির ডিজিজ। আমরা নিরাকারে যেতে চাইছি। আমার ড্রিমটা শুনুন, একটা শ্মশান, বিশাল বিশাল ম্যাজেস্টিক, মাইটি শ্মশান। প্রেতের দল, প্রেতিনীর হাসি, চিতা বহ্নিমান, শ্মশানকালী। প্রেতেরা চাঁদার খাতা হাতে খ্যা খ্যা করে ঘুরছে। লোক দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে, আত্মহত্যা করছে, নিহত হচ্ছে। ঢাউস ঢাউস স্পিকারে গান ছাড়ছে, আঁখো মে লাগা পেয়ার, চাকুম চাকুম। তিনটে 'ব' নিয়ে আমাদের কারবার চারটেও বলতে পারেন। ফোর বজ—বাঁদর, বন্ধ, বারোয়ারি, বম্ব।
আপনি	:	তাহলে পাওয়ারের কি হবে।
সি এম	:	পাওয়ার বাড়ান। চশমা পাল্টান। ছানি কাটান। তার আগে দেখুন ম্যাচিয়োর করেছে কি না?
আপনি	:	আজ্ঞে, সে পাওয়ার নয়।
সি এম	:	তাহলে আবার কি? গান শোনেননি, চোখের নজর কম হলে আর কাজল দিয়ে কি হবে!

[মন্ত্রীর ঘরের দরজা খুলে গেল। বলিষ্ঠ এক ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন।]

ভদ্রলোক	:	আমি পাওয়ার প্ল্যানার। ইন শর্ট পিপি।
মন্ত্রী	:	বসুন, বসুন। আমরা ইতিমধ্যে অনেক দূর এগিয়েছি।
শিল্পসচিব	:	ভুল হল স্যার, অনেক দূর পেছিয়েছি।
বিদ্যুৎসচিব	:	ভুল হল স্যার, অনেকটা পৌঁচিয়েছি।
বেসিক ঘোষ	:	না না, অনেকটা কেঁচিয়েছি।
রুট রায়	:	না, না, অনেকটা গেঁজিয়েছি।
পিপি	:	আপনারা যাই করে থাকুন করুন, আমরা আমাদের মেগা-কম্পিউটারে প্রবেলমটা ফিড করেছিলুম, সলিউশান এসেছে। আপনাদের কসমেটিক ট্রিটমেন্টে চেহারা ফিরবে না। ডিজিজ প্ল্যান্টে নেই, আছে আমাদের জাতীয় মনে। অন্য পাওয়ার পাওয়ারফুল হওয়ায় আসল পাওয়ার শেষ। কয়লায় লোহা। কর্মচারীতে ইউনিয়নের গরল। ম্যানেজমেন্টে ভয়ের খোঁচা। আপনারা দোদুল্যমান।
মন্ত্রী	:	সত্যি কথা বলেন কেন? প্রাণের মায়া নেই!
পিপি	:	অ্যামনেও মরবো, অমনেও মরবো। আপনারা একটা কাজ

ভালই করেছেন, মেরে মেরে মরণটাকে শেষ করে দিয়েছেন।

মন্ত্রী : বিনিই আসছেন, গাদাগাদা কথা শুনিয়ে যাচ্ছেন। সলিউশানটা বলুন না!

পিপি : দিন পেছোতে হবে। অর্থাৎ ঘড়িকে আমরা এক ঘন্টা এগিয়ে দোবো। সাতটার জায়গায় আটটা বাজাবো।

বেসিক ঘোষ : দেখেছেন, আমাদের মাথা কম্পিউটারপ্রতিম। বলছিলুম না জ্যাম করতে হবে।

মন্ত্রী : মাত্র এক ঘন্টায় কী হবে! এইরকম করুন না, বেলা বারোটায় ভোর হল, তেরটায় ব্রেকফাস্ট, পনেরটায় অফিস, সতেরটায় ছুটি, আঠারোটায় যে যার বাড়ি।

পিপি : মানে, যাকে বলে বারোটার জায়গায় আঠারোটা বাজানো।

মন্ত্রী : একসময় জমিদাররা বারোটার সময় ঘুম থেকে উঠত। ছাতে উঠে পায়রা ওড়াতো।

শিল্পসচিব : এ শর্ট অফ প্রিন্সিপ্‌ল অ্যাপ্রোচ।

ফান্ডামেন্টাল

মিত্র : ব্যাক টু ফিউডালিজম।

বেসিক ঘোষ : দিন ছোট রাত বড়।

ডিপ দাস : মানে চির শীত।

রুট রায় : মানে হাইবারনেশান।

মন্ত্রী : মানে, একটা ইতিহাস, একটা রেকর্ড। যা কেউ পারেনি, টার্নিং দি ক্লক।

[ক্যাঁক, ক্যাঁক, টেলিফোন]

মন্ত্রী : হ্যালো। পাওয়ার। না, না, শাওয়ার না পাওয়ার। ধ্যার মশাই, গ্রেপস আর সাওয়ারের সাওয়ার নয়, না না, বাথরুমের শাওয়ারও নয়, পাওয়ার। হ্যাঁ হ্যাঁ পাওয়ার ও-এর পাওয়ার। এতক্ষণ লাগল বুঝতে! কি প্রবলেম! অ, ডিউক আসছেন! সন-এ-ল্যুমিয়েরের! পাওয়ার চাই। ময়দানের ফাউন্টেন! আমরা এক্সপার্টদের ডেকেছি। মিটিং চলছে। এ মিটিং-এ কিছু না হলে, ময়দানে বিশাল জনসভা ডাকব। তাতেও না হলে বের করব, ব্রহ্মাস্ত্র, পদযাত্রা,

মানবশৃঙ্খল। কী বলছেন? এতেও যদি না হয়! আমরা
আবার বসবো আমাদের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে—ফাবেড্রিক।
বুঝলেন না। ফান্ডামেন্টাল, বেসিক, ডিপ, রুট। রুটে যেতে
পারলেই তো হয়ে গেল। আরে মশাই, মুটে নয়, রুটে।
ঘুঁটে? ঘুঁটে নয় রুটে। দাঁড়ান—আর ফর রোগ, ও ফর ওল্ড,
ও ফর ওভার, টি ফর টাউট। কে বলছেন আপনি!

[মন্ত্রীর হাত থেকে রিসিভার পড়ে গেল। কাতরে উঠলেন—ওরে বাবারে! ইংল্যান্ড থেকে সি এম কথা বলছিলেন। আর এ তো রিভার ছিল। ও তে তো অলিভ ছিল, টি তে তো টেররিফিক ছিল] ছোটখাটো একটা হার্ট অ্যাটাক। শর্ট অফ বোস উঠে গিয়ে ফায়ার অ্যালার্মে হাত রাখলেন। চিৎকার উঠল, আগুন, আগুন। শর্ট সার্কিট, শর্ট সার্কিট।

পাশবালিশ

—

আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়। ধারালো ছুরির ফলা নিয়ে ঘ্যাঁচোর-ঘ্যাঁচোর করলে হাত কেটে যায়। বোমা নিয়ে লোফালুফি করলে ফেটে যায়। এইসবই হল ব্যবহারিক জ্ঞান। মানুষ হাতে-নাতে শিখে ফেলে। বই পড়ার দরকার হয় না। মানুষ বিয়ে করে। করে করে শেখে। অনেক কিছু শেখে। নানা রকমের ফুল, লতাপাতা, গাছ আছে। এক একরকম বর্ণ, গন্ধ। যেমন বিছুটি। লাগলেই চুলকোয়। যেমন লঙ্কা, চিবোলেই ঝাল। সেই রকম আমার অর্ধাঙ্গিনীর স্বভাব হল, কিঞ্চিৎ রাগপ্রধান। তা সঙ্গীতের যেমন বিভিন্ন ধারার রাগপ্রধানও আমাদের ভাললাগে, সেইরকম রাগপ্রধান স্ত্রীকেও আমরা আমাদের জীবনে সইয়ে নি। সাবধানে নাড়াচাড়া করি। করলেও দু'একবার বেসামাল হয়ে যেতে পারেই; তখন ভুলের মাশুল দিতে হয়। ভুল করাই তো মানুষের ধর্ম!

অ্যামোনিয়ার বোতলের গায়ে লেখা ছিল—কোনও ক্রমে চোখে দু'এক ফোঁটা যদি ছিটকে লাগে, তাহলে চোখে ঠাণ্ডা জলের প্রচুর ঝাপটা মারবে। কি হলে, কি করতে হবে জানা থাকলে অনেক সুবিধা হয়। অনেক দিন সংসার করার ফলে, ফেটে গেলে কি করতে হয় আমার জানা হয়ে গেছে, আর কি করলে ফাটবে তাও জানি। লেজ ধরে টেনো না। বাঘের একটা লেজ। আমার স্ত্রীর অনেক লেজ। বড় লেজ হল, শ্বশুরবাড়ির লেজ। শ্বশুর বাড়ির কারোর সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করা চলবে না। সে বাড়ির ইট ভাল, পলেস্তারা ভাল, এমন কি সিঁড়িতে বেড়ালটাও আসল কবুলি বেড়াল। শ্বশুর মশাইয়ের গোঁফ জোড়া একেবারে ক্লোদ স্ট্যালিনের গোঁফ। হাসিটা মোনালিসার পুং সংস্করণ। শশ্রুমাতার ধরাধরা গলায় পারস্যের বুলবুল। তাঁরা দানধ্যানে কর্ণ, জ্ঞানে ভীষ্ম, ধর্মে যুধিষ্ঠির, বীরত্বে অর্জুন। শ্যালক শ্রীকৃষ্ণ। আমার নিজের ধারণা সকলেই অল্পবিস্তর পাগল। দিনে রাতে এক একজন বার চারেক স্নান করে। একই সঙ্গে, টি ভি, রেডিও, রেকর্ড-প্লেয়ার ও হইচই গল্প চলে। সকলেই বলতে চায়, কেউ কিছু শুনতে চায় না। যে কেউ যখন খুশি ঘুমিয়ে পড়তে পারে। আবার জেগে থাকার মেজাজ এসে গেলে বিছানার সঙ্গে তিন রাত কোনও সম্পর্ক থাকে না। সকলেরই স্বাস্থ্য-বাতিক। অসুখ হবার আগেই ওষুধ খেয়ে বসে থাকে। সব ভিটামিন-পাগল। শীতকালে খরগোসের মতো বাঁধাকপি আর গাজর কাঁচা চিবোয়। কথায় কথায় সকলকে উপদেশ—খুব শাক-সব্জি খাও, গ্রিন ভেজিটেবলস। ফলে এই হয়েছে,

নিমন্ত্রিতদের ভাবতে হয়—ওই বাড়িতে পাত পাতবে কি না! সবাই তো আর ছাড়া গরু নয়, যে আস্ত একটা বাগান খেয়ে ফেলবে! শশ্রুমাতা একটার সময় আহারে বসে দুটোর সময় ওঠেন—চিবিয়ে যাচ্ছেনতো, চিবিয়েই যাচ্ছেন, ডাঁটা। শ্যালক শ্রীকৃষ্ণ কথা বলতে বলতে ব্যায়াম করে। কব্জি ঘোরাচ্ছে, ঘুরিয়েই চলেছে। এদিকে কথাও বলছে। রাস্তায় কারোর সঙ্গে দেখা হল, তিনি হয়তো জিজ্ঞেস করছেন, কে কেমন আছে। ওই পাঁচটা মিনিটও যেন বৃথা না যায়—পায়ের আঙুলের ওপর ভর রেখে দেহটাকে ওঠাচ্ছে আর নামাচ্ছে। পায়ের গুলির ব্যায়াম। যিনি কথা বলেছিলেন অবাক হয়ে বলছেন—'ওরকম করছ কেন?' শ্যালক বলবে—'আপনি বলে যান। মাইন্ড করবেন না।' প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেন আসবে। হঠাৎ গোটাপঞ্চাশ বৈঠক মেরে দিলে ঝপাঝপ্। ডেনটিস্টের চেম্বারে বসে আছে, হঠাৎ কি মনে হল পায়ের ব্যায়াম করতে গিয়ে সেণ্টার-টেবিল উল্টে গেল। ম্যাগাজিন-ফ্যাগাজিন সব ছত্রাকার। অন্য যাঁরা বসেছিলেন, তাঁরা শুধু অবাক হলেন না বিরক্তও। একগাল হেসে বললে, 'লেগ-স্ট্রেট করতে গিয়ে উল্টে গেল।' 'আমরা মরছি দাঁতের যন্ত্রণায় আর আপনি করছেন লেগ-স্ট্রেট।' "আজ্ঞে, আমারও তো একই অবস্থা। দাঁত থেকে পায়ের দিকে মনটাকে ঘোরাবার চেষ্টা করছিলুম আর কি!'

সকলেরই যে মাথার স্ক্রু ঢিলে তার প্রমাণ, আমার সহধর্মিনীকে একবার পাগল বললেই হল। একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠবে। তখন একেবারে অন্য চেহারা। নাকের পাতা ফুলে উঠল। চোখ-মুখ লাল। তখন বয়েসটাও যেন কমে যায় অনেক। রাতের সমুদ্রের ফরফরাসের মতো দেহ-ত্বক জ্বলজ্বলে হয়ে ওঠে। আমি ভুলেও পাগল বলি না। স্বামী হলেও বোকা-পাঁঠা নই। কি থেকে কি হয়, আমার সব জানা আছে। আমি জানি, স্ত্রী হল চীনে মাটির বাহারী ফুলদানি। সেই ফুলদানিতে জীবনের যত দুঃখসুখের ফুল সাবধানে সাজিয়ে রাখতে হয়। অফিসের বড়কর্তার সঙ্গে ইয়ার্কির চলে। ইয়ারকি চলে পুলিস-সার্জেণ্টের সঙ্গে। এমনকি চিড়িয়াখানার বাঘের সামনে দাঁড়িয়ে চুমখুড়ি মারা যায়; কিন্তু ইয়ারকি চলে না স্ত্রীর সঙ্গে। সব সময় মন যুগিয়ে চলতে হয়। খুশ মেজাজে রাখতে হয়। দেশলাই কাঠি আর খোলের সম্পর্ক বেশি ঘষলেই ফ্যাঁস। মাঝে মধ্যে পাগল বলেই পেটের ছেলে। একালের শ্যায়না ছেলে, সে পিতা স্বর্গও বোঝে না, বোঝে না জননী জন্মভূমিশ্চ। তার স্বার্থে ঘা লাগলেই সারা বাড়ি দাপিয়ে বেড়ায়, আর রোজ, হয় প্রাতে না হয় সায়াহ্নে মায়ের সঙ্গে বাক্য-যুদ্ধ লাগবেই লাগবে, আর ঠিক হেরে যাবার মুহূর্তে ছাড়বে সেই পশুপাত

অস্ত্র—তুমি একটা পাগল। সঙ্গে সঙ্গে ছেলের মা ফসফরাসের মতো জ্বলে উঠবে—তুই পাগল, তেরি বাপ পাগল, তোর ঠাকুরদা পাগল, তোর চৌদ্দ-পুরুষ পাগল। আমার তখন লাফিয়ে উঠতে ইচ্ছে করে, কোলা ব্যাঙের মতো; কিন্তু লাফাই না। আমি তখন মনে মনে বলি—পাগল আর নারীতে কি না বলে, ছাগলে কিনা খায়! অর্থাৎ পাগল শব্দটি হল মধ্যম লেজ। কর্ণে প্রবেশমাত্রই বহ্নিমান অবস্থা। আমার চতুর্দশ পুরুষকে পাগল প্রমাণের পর অধস্তন চৌদ্দ পুরুষকে ধরে টানাটানি। আমার ছেলে—তস্য ছেলে-তস্য ছেলের ছেলে। মানে ছেলে সেলে। চৌদ্দ ভুবনের মতো—মাঝে ভুঃ মানে আমি, এই প্রতিবেদক। উর্ধ্বে, ভূঃ, স্বঃ, মহ, জন, তপঃ, সত্য। ছটি স্বর্গলোক। অধে পাতাল, তারও সাত ভাগ অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল, পাতাল। সমস্ত তছনছ করে, নিজের রক্তের চাপ দুশ'দশে তুলে অবশেষে সত্যিই তিনি সাময়িক পাগল হলেন। ডাক্তার, বদ্যি, কড়া ঘুমের ওষুধ। পনের দিনের মত শয্যাশায়ী।

তৃতীয় লেজটি হল, অন্যের বউয়ের প্রশংসা। যদি কোনও ভাবে একবার বলে ফেলেছি আহা অমুকের বউটি কেমন সুন্দর, যেমন দেখতে তেমন স্বভাব। মিষ্টি মুখ। মিষ্টি কথা। শ্বশুর বাড়িটিও ভারি সুন্দর। তিন ভাই, তিনজনেই ডাক্তার। একজন দাঁতের। একজন কানের। একজন মাথার। গোটা পরিবারটাই মানুষের মুণ্ডু নিয়ে পড়ে আছে। ওর নিচে কেউ আর নামেনি। বউটি আবার শিল্পী। তুলির এক আঁচড়ে একটা মুখ নিমেষে ঝরনা, পাহাড়, বনস্থলী। এইসব কথা, মধ্যরাতে, একান্তেই হতে পারে। অনেকটা আমার স্বগতোক্তির মতো। অলস মুহূর্তে মানুষ এই রকম করতেই পারে। তার করার হক আছে। কি পেয়েছি, আর কি পাইনি। এ মতো উক্তির পর এ যে কোনও বাঙালি, গলায় সুর থাকুক আর না থাকুক গুনগুন করে গাইবেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই বিখ্যাত গান—

কী পাই নি তারি হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজি।

আজ হৃদয়ের ছায়াতে আলোতে বাঁশরি উঠেছে বাজি।।

এই মধ্যরাতের একান্ত বিলাসিতাটুকু সব মানুষই প্রশ্রয় দিতে পারে। শ্বাস আর দীর্ঘশ্বাস এই নিয়েই তো জীবন। যা চাই তা পাই না, যা পাই তা চাই না, এইটাই তো সত্য। সত্যেও ভদ্রমহিলার অসহ্য। সঙ্গে সঙ্গে বলবে 'যাও না, তার কাছেই যাও না। আমার কাছে কেন। কি কথা! এমন কথা কোনও ভদ্রলোকে বলে। ভদ্রমহিলারই বলতে পারে। আমি যে পরস্ত্রীর সঙ্গে পরকীয়া করার জন্যে এই সব কথা বলছি! আমার কি ভীমরতি হয়েছে। আমার এমন সোনার চাঁদ বউ থাকতে হুলো বেড়ালের মতো অন্যের হেঁসেলে ছোঁক ছোঁক করতে যাবো

কেন। গিয়ে ধোলাই খেয়ে মরি আর কি! এরপর শুরু হলে গেল লং-প্লেয়িং—'জেনে-শুনে, দেখে-শুনেই তো বিয়ে করেছিলে। আমার জামরুলের মতো নাক, প্যাঁচার মতো চোখ, ঘুটঘুটে অমাবস্যার মতো গায়ের রঙ। শিরিষ কাগজের মতো গলা। বিয়েটা তখন না করলেই পারতে! আহা, কত কষ্টই না আমার জন্যে করেছিলে। ট্যাকে নিয়ে ঘুরেছিলে ময়দানে, ভিক্টোরিয়ায়। আড়াই হাত লম্বা এক একটা চিঠি। ধার করে উপহার। গাছতলায় 'বসে বসে ঘাসে টাক। তখন অত কসরৎ না করলেই পারতে'। কে বলেছিলে আমার জন্যে হেদিয়ে মরতে।' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস। তারপর খচমচ করে বিছানা থেকে নেমে মেঝেতে ধপাস। কিছুক্ষণ পরেই আমার সাধ্য-সাধনা। একবার করে হাত ধরে টেনে তুলি পরক্ষণেই ল্যাং করে নেতিয়ে পড়ে। যেন প্ল্যাস্টিক গার্ল। দায় তো আমার। সারারাত মেঝেতে পড়ে থাকলে, পরের দিনই মিনিটে পঞ্চাশটা করে হাঁচি। ডাক্তার-বদ্যি। কাঁড়ি টাকার শ্রাদ্ধ। নিজে বাঁচার জন্যে বউকে বাঁচাতে ছুটি। কে বলেছে তোমার জামরুলের মতো নাক, প্যাঁচার মতো চোখ। অমাবস্যার মতো রঙ। তুমি আমার 'সায়রাবানু।'

আমি জানি, বড় লেজটা ধরে টানলে, একমাস বাক্যালাপ বন্ধ। মধ্যম লেজে টান মারলে সাতদিন। ছোট লেজে টান মারলে গোটা একটা রাত সাধ্য-সাধনা। টেনে তুলি, আবার তুলি। ভীম ভবানী হলে পাঁজাকোলা করে মেঝে থেকে বিছানায় ফেলে ঠেসে ধরতে পারতুম। শরীরে সে-শক্তি নেই। অবাক হয়ে ভাবি, হিন্দি ফিল্মের নায়করা আস্ত একটা নায়িকাকে কেমন করে পাঁজাকোলা করে ঘুরে ঘুরে সাতশো ফুট লম্বা একটা গান গায়। ওইরকম হিম্মৎ না থাকলে ব্যাচেলার হাওয়াই ভাল।

সংসারে মোটামুটি সবই ভাল। দুঃখ, সুখ, অসুখ-বিসুখ, টানাটানি-ছাড়াছাড়ি সবই সহ্য করা যায়, অসহ্য স্ত্রীর গোমড়া মুখ। বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরি হলে আকাশ ছেয়ে যায় মেঘে। সূর্যের মুখ ঢেকে যায়; অন্ধকার, বিষণ্ণ দিন। দিনের পর দিন। স্ত্রী যেন সেই বঙ্গোপসাগর। সব সময়েই নিম্নচাপ তৈরি হয়ে আছে। সদা মেঘলা। সেই মুখে এক চিলতে হাসির জন্যে কি সাধ্য-সাধনা! যত তেল স্ত্রীকে ঢালা হয়, সেই তেল কড়ায় ঢাললে একটা তেলে ভাজার দোকান সারা বছর অক্লেশে চালানো যায়। সব চেয়ে মারাত্মক হল, কথায় কথায় খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া। সামান্য একটু ঠুকঠাক হল কি, খাওয়া বন্ধ। গোটা সংসারকে খাইয়ে, খাবার দাবার সব তুলে রেখে, একটা বই কি বোনা নিয়ে বসে পড়লেন। অন্য সময় বই কি বোনার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক থাকে না। একটা

সোয়েটার—সে যেন ধারাবাহিক উপন্যাস। বছরের পর বছর চলছে তো চলছেই। ছিড়িক ছিড়িক ইনস্টলমেন্ট। অন্য সময় ঘর-দোর এলোমেলো টেবিলে চেয়ারে ধুলো, দেয়ালের কোণে কোণে ঝুলের ঝালর। এই সময় তিনি মহাকর্মী। যত কাজের ধুম। উদ্দেশ্য দেখানো, দেখো অনশনে আছি, কিন্তু কাজে দেহপাত করছি। আমি এক পেট খেয়ে বিছানায় চিৎপটাং তিনি শুয়ে আছি পাশে খালি পেটে। দাঁতের ফাঁকে বড় এলাচের দানা। অন্ধকার ঘর। নীল মশারির ঘেরা টোপ। চারপাশ নিস্তব্ধ। শুধু দাঁতে বড় এলাচের দানা কাটার কুট কুট শব্দ। অনেকটা আমার বিবেকের দংশনের মতো। স্বার্থপর দামড়া। নিজে পেট ফুলিয়ে পড়ে আছে। পাশে তোমার স্ত্রী অনশনে, তোমারি দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে নীরব প্রতিবাদ জানাচ্ছে। দাঁতে দাঁতে বড় এলাচের দানার কিটিস কিটিস নয়, আমার বিবেক ইঁদুরে আমারই জীবনকাব্য কাটছে মাঝরাতের অন্ধকারে। এই একচালেই আমার মতো খেলোয়াড় কাত হয়ে যায়। প্রথমটায় বোঝা যায় না, মানে বুঝতেই দেয় না যে, খাওয়া বন্ধ হবে। নদীতে জল মাপার জন্যে ব্রিজের পিলারে স্কেল লাগানো থাকে। জল বিপদসীমা লঙ্ঘন করছে কিনা বোঝা যায়। স্ত্রী-নদীতে রাগ বিপদসীমা ছুঁয়েছে কিনা বোঝার উপায় নেই। সামান্য কথা কাটাকাটি এই ইলেকট্রিক বিল নিয়ে, কি চিনির খরচ বেশি হচ্ছে বলে, কি হয় তো বলেই ফেললুম 'আমার কি তেলকল আছে। আমার বাপের তেলকল দেখেছ বলিনি কারণ নিজেই নিজের বাপ তুলবো, এমন ছোটলোক আমি নই।' বা 'হয়তো বললুম-আমার কি চা বাগান আছে।' বলতে পারতুম আমার শ্বশুরের কি চা বাগান আছে-মাসে সাত কিলো চা, রোজ সাতটা লোক এসে চা খেয়ে গেলেও এত খরচ হত না। এইসব অভিযোগ যে কোনও স্বামীই, যে কোনও স্ত্রীকে করতে পারে। না-ই যদি পারবে তাহলে বিয়ে করা কেন? এই তো আমার তিন বন্ধু, তিন জাঁদরেল মহিলাকে বিয়ে করেছেন-জজ, প্রিনসিপ্যাল আর শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের নেত্রী-যে কোন নির্বাচনে এম এল এ বা এম পি হয়ে যাবেন অক্লেশে, হেসে হেসে। আমার সেই তিনবন্ধু কি নতজানু হয়ে থাকে? কাঁধে তোয়ালে ফেলে 'যো হুকুম মেমসাব বলে স্ত্রীকে প্রদক্ষিণ' করে। কোর্টে তুমি জজ। রোজ একটা করে আসামীকে তুমি ফাঁসিতে লটকাও, কিন্তু বাড়ীতে তুমি গদাইয়ের স্ত্রী। কথায় কথায় ক্ষেপে বোম হলে সংসার তো ভেটকে যাবে। দড়ির ওপর ব্যালান্স করে কতক্ষণ হাঁটা যায়। হয় তো একটু চড়া গলায় বলেই ফেললুম 'বাথরুম থেকে বেরোবার পর আলোটা নেভাতে হয়, তা না হলে হাতে হ্যারিকেন হয়। সংসার করার এই এ বি সি-টা তোমার মা

শেখাননি। এর জন্যে তো ডিগ্রি-ডিপ্লোমার প্রয়োজন হয় না।' মাসে মাসে দুহাজার টাকা করে ইলেকট্রিক বিল এলে, কোনও আদমি কোনও অওরতকে, সোনা আমার, মানু আমার, খেয়াল করে আলোটা একটু নিভিও; অকারণে পাওয়ার খরচ করো না, বলতে পারে কি? আমি তাও বলে দেখেছি দয়া করে আলোটা নেভাও। আমার এমনই নিখাদ নাইট্রিক অ্যাসিড ধোয়া প্রেম। তাও দেখি মুখের চেহারা জামবাটির মত হয়ে গেল। টেবিলে কাপ নামল যেন আহাম্মদ জান খেরকুয়ার তবলায় শেষ তেহাই। ব্যাপারটা কি? না ওই দয়া শব্দটি। ওই শব্দটিতে হিমের মত জমাট বেঁধে আছে, শ্লেষ আর ব্যাঙ্গ। এতো মহা জ্বালা। ভাষাতাত্ত্বিক চমস্কির কাছে গিয়ে ভাষাবিজ্ঞান শিখে এসে সংসার করতে হবে। দুহাজার টাকা বিলটা বড় কথা নয়। ওটা তোমার ম্যাও। তুমি মা তুললে কেন? কেন বললে, এ বি সি-শিখিনি? আর ফার্স্টবুকের এ বি সি বলিনিরে ভাই সংসারের এ বি সির কথা বলেছি। আর মা তুলবো কেন? বাপ তুললে গালাগাল হয় বুদ্ধিটা আমার আছে। তোমার মতো নই। তুমি তো সারা দিন বার দশেক আমাকে তোলো আর ফ্যালো। ছেলে যখনই মুখের ওপর চোটপাট করে বলে-পারবো না যাও। তুমি অমনি বলো, তোর বাপ পারবে? তা তুমি যখন ছেলের বাপ তোলো, তখন বেশ প্রেম প্রেম লাগে।

কত বড় ডিপ্লোম্যাট। সংসারে যত পাকছে ডিপ্লোম্যাসিটা তত বাড়ছে। রাত সাড়ে নটা-কি দশটার সময় হাঁক পড়ল—'সব খাবে এস।' আমারাও বাধ্য ছেলের মতো বসে পড়লাম যে যার জায়গায়। সন্ধ্যের দিকে একটু কথাকাটাকাটি হয়েছিল-বিষয়টা খুবই তুচ্ছ-একটা গেঞ্জি। আমার একটা গেঞ্জি আমিই কেচে ছাদের তারে শুকোতে দিয়েছিলুম। একদিন গেল, দু'দিন গেল, সাতদিন হয়ে গেল কেউ আর তোলে না; যেন রাস্তার ইলেকট্রিক তারে আটকানো সুতো, ছেঁড়া ঘুড়ি। আমিও তুলি না। দেখছি। টেস্ট করছি, সংসারে আমার জন্যে কতটা ভালবাসা আর কর্তব্য বোধ জমা আছে। কে কতটা ভাবে আমার কথা! দেখলুম, ভাঁড়ে মা ভবানী। তোমার শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে। দৌড়-ঝাঁপ চলছে। সহজে তুমি টাসছ না। টাকার পাইপ লাইন ঠিকই চালু থাকবে। তবে আবার কি। সোস্যাল সার্ভিসের কি প্রয়োজন? মোটা দাগের সেবাই যথেষ্ট। গজাল সার্ভিস। বাসের আসনে ছোট একটা পেরেক উঠে থাকলে কে আর নিজের থেকে সার্ভিসিং করতে যাচ্ছে। যতক্ষণ পাবলিক না চ্যাঁচাচ্ছে। ইঞ্জিনটাই তো সব। বাস গড়াচ্ছে গড়গড়িয়ে। দানাপানি দিয়ে টাট্টুকে ছেড়ে দাও। যা ব্যাটা রোজগার করে আন। তার গেঞ্জি তিনমাস কেন, অবলুপ্ত হয়ে

যাওয়া শুরু ঝুলবে। পাজামার লজ্জা স্থান ফেঁড়ে থাকবে। সেলাই আজও হচ্ছে, কালও হচ্ছে। বললেই তীক্ষ্ন প্রশ্ন, তোমার ওটা ছাড়া আর কোনও পাজামা নেই; জামা কিনে আনার পর যে কদিন বোতাম থাকে। তারপর একটা একটা করে ঝরতে থাকে। বোতাম তো আর ঝরাপাতা নয়, জামাও গাছ নয়, যে শীতে ঝরিয়ে বসন্তে বোতাম সাজিয়ে দেবে। প্রথমে গেল গলা, পরে গেল পেট, শেষে গেল বুক। সব হাওয়া। আর তো চলে না। জামাতো ব্লাউজ নয় যে, গোটা গোটা সেফটিপিন লাগিয়ে ম্যানেজ করে নেবো। মেয়েদের আটপৌরে ব্লাউজে বোতাম থাকে না। কে বসাবে। আবার বসাবে ওই গজালই সহজ রাস্তা। মেয়েদের তো বউ হয় না, যে বসিয়ে দেবে। তারা নিজেরাই বউ। আর বউ হবার পর তাদের কাজ এত বেড়ে যায়, যে তুচ্ছ ব্যাপারে মাথা ঘামাবার সময় থাকে না। মা কালীর গলায় মুণ্ডমালা মেয়েদের বুকে সেফটিপিনের-মালা বললেই বলবে পরোপকার প্রবৃত্তি। ওখানে না কি স্পেয়ারও থাকে। প্রয়োজনে অন্যকে ধার দিতে পারে। সাবেকি ধারণা নিয়ে বিয়ে করলে অনেক দুর্ভোগ! জামা, প্যান্ট, ইস্ত্রি, সেলাই, বোতাম বসানো, ফিতে পরানো, মাথা টেপা ইত্যাদি নিম্নবর্গের কাজ বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত এসেই খতম। প্রায়ই শুনতে হয়—নিজে করে নিতে পারো না। আমি একটা কেমিস্ট্রির লোক টেলারিং তো শিখিনি। সিউয়িং, কুকিং, নার্সিং এইসব আমার ছেলেকে শেখাতে হবে, তা না হলেই মরবে গৃহকর্মে সুনিপুণা বিশেষণ ঘুরে গিয়ে ছেলেদের গায়ে লাগবে গৃহকর্মে সুনিপুণ। বলবে, কি রকম স্বামী? গ্যাস ফুরিয়ে গেলে তোলা উনুনও ধরাতে পারে। কেরোসিন স্টোভে পলতে পরাতে জানে। পোড়া কড়া মাজতে পারে। ছেলে ধরাও জানে। সবই যেন উল্টেপাল্টে গেল।

তা ওই তুচ্ছ-গেঞ্জি। যাকে বলে তিল থেকে তাল। সিঁড়ি ভেঙে ছাদে উঠতে বুক ধড়ফড় করে। আচ্ছা করে। কিন্তু ট্যাং ট্যাং করে এখানে, ওখানে ঘোরার সময় বুক ধড়ফড় করে না। ও সেটা হল সমতলে। ভাইয়ের বিয়ের সময় একতলা, তিনতলা দাপিয়ে বেড়ালে? বেড়াতেই হল কর্তব্য। গেঞ্জিটা নিজেও তো তুলতে পারতে? এইটুকু দয়া তো করা যেত! দেখেছিলুম, তুমি কর কি না? না, তোমার তো কিছুই করা হয় না। তোমার আর একটা বউ এসে করে দেয়। সে বউ আছে কোথায়? কোথায় পুষছো তুমিই জানো? তা না হলে মাসে মাসে এত খরচ হচ্ছে কি করে? টাকায় থই পাওয়া যাচ্ছে না। তোমার বুঝি সেইরকমই ধারণা। তোমার বয়সের কোনও পুরুষকে বিশ্বাস নেই।

তারে ঝোলা একটা গেঞ্জি। কোথাকার জল কোথায় গড়াল। আমাদের

পরিবেশন করা হয়ে গেল। সকলেই বসে গেল, তিনি বসলেন না। জিজ্ঞেস করলুম, 'কি হল' তুমি বসলে না? গম্ভীর মুখে, খুব পসারঅলা ডাক্তারের মতো বললে, 'ক্ষিদে নেই। পরে খাবো।' সেই পর আর সে রাতে হল না, পরের রাতেও এল না। ব্যাপারটা লাগাতারের দিকে চলে গেল। শেষে যা হয়, দুহাত তুলে সারেণ্ডার। মনে মনে প্রতিজ্ঞা, এও তো এক ধরনের অপমান, সেই ছাত্রজীবনের মতো, প্রায় কান ধরে নিলডাউনের-অবস্থা। এমন কাজ আর করব না। যা হচ্ছে হোক। সংসার ভেসে যাক চুলোয় যাক, আমাকে কেউ দেখুক, না দেখুক, চোখ-কান বুজিয়ে থাকবো। বয়েস হচ্ছে। রক্তের আর সে জোর নেই। দিনগত পাপক্ষয় করে যেতে পারলেই হল। বধূ-হত্যার যুগ পড়েছে, অনশনে প্রাণ বিয়োগ হলে পুলিসে আর পাবলিকে পিটিয়ে লাশ করে দেবে।

বেশ সাবধানে তেল দিয়ে, তা দিয়ে মোটামুটি শান্তিতেই দিন কাটছিল। যাকে বলে ট্যাক্টফুলি। অনেক প্ররোচনা এসেছিল ও তরফ থেকে। ফাঁদে পা দিই নি। তবু মানুষ তো, হঠাৎ একদিন লেজে পা পড়ে গেল। পড়ল, ছেলেকে উপলক্ষ্য করে। ঘটনাটা সেই ঘটলো। মায়ে-ছেলেতে অনেকক্ষণ চুলোচুলি হচ্ছিল বাজারের হিসেব নিয়ে। হিসেব না কি মিলছে না। একেবারে দশ টাকার তঞ্চকতা। শেষে সেই। ছেলে বললে এটা একটা পাগল। বদ্ধ পাগল। সঙ্গে সঙ্গে কোপ পড়ল আমার ঘাড়ে— 'কি শুনতে পাচ্ছ না! না এখন কালা হয়ে গেছ? পরিবেশটাকে সহজ করার জন্যে আমি গান গেয়ে উঠলুম—যখন কেউ আমাকে পাগল বলে। তার প্রতিবাদ করি আমি। যখন তুমি আমায় পাগল বলো। ধন্য যে হয় সে পাগলামি। ফল আরো খারাপ হল! যেন আগুনে ঘি পড়ল। একটু তাণ্ডবর হল। তরতরিয়ে ছাদে উঠে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। পড়ে রইল সংসার।

যখন আমার যৌবন ছিল, প্রেমে যখন টইটম্বুর হয়ে আছি, রসে পড়া রসগোল্লার মতো, সেই সময় এমত অবস্থায়, পাইপ বেয়ে, কার্নিস বেয়ে, যায় প্রাণ থাক পণ করে ছাদে গিয়ে ল্যাণ্ড করতুম। স্বরোমুশের মতো। সে বয়েস তো আর নেই। সে মনও নেই আর। এখন মনে বাজছে ধ্যাত্ তেরিকা সুর। অনেক খোশামোদ করেছি, আর না। হয় ওসপার না হয় এসপার। থাকো বসে ছাদের গোঁসাঘরে। মানভঞ্জন পালা আর গাইব না। তোমারও অনশন, আমারও অনশন। অনশনের লড়াই চলুক। দেখি কে হারে আর কে জেতে! হেঁকে বলে দিলুম—আমিও খাবো না। ঢ্যাং করে যেন একটা শব্দ হল কোথাও। যাত্রার দলে যুদ্ধ শুরুর আগে যেমন বাজে। যে যতই সিটি মারুক, এবার আমি কৃতসঙ্কল্প। প্রথম রাতে যে বেড়াল কাটা হয় নি, সেই বেড়াল আমি না হয় কাটবো শেষ

রাতে। মরতে হয় মরবো। এ মরণ আমার আধ্যাত্মিক আখ্যা পাবে। আমি শহিদ হবো। পথের ধারে বেদী না হয় না-ই হল। না-ই হল মঠ।

ছেলে পরোক্ষে বললে, 'যত সব বয়েস বাড়ছে ততই যেন খোকা হচ্ছে। দু'দিন, তিন দিন অন্তর অন্তর দামামা বাজালেই হল। নাও, সব না খেয়ে মরো, আমি চীনে রেস্তোরাঁয় চাওমিন মেরে আসি।' মনে মনে বললুম, 'তুমি আর বুঝবে কি, সেদিনকার ছোকরা! বিবাহিত মানুষের আমরণ সংগ্রাম স্ত্রীর সঙ্গে। বাঁকা লেজকে সোজা করতেই জীবন শেষ। যাবার ক্ষণে শেষ কথা—আমি আর পারলাম না। হেরে মরে ভূত হয়ে ঘাড় মটকাবো স্বামীদের এমন বরাত করেই সোজা স্বর্গে। নরক-যন্ত্রণা স্ত্রীর হাতেই হয়ে যায় কিনা! ভূত হতে পারলে কত স্ত্রীর যে ঘাড় মটকে যেত!

স্নানটান করে শুদ্ধ শরীরে, শুদ্ধ বস্ত্রে, মহাত্মা গান্ধীর 'আত্মজীবনী' বের করে আনলুম খুঁজে পেতে বইয়ের তাক থেকে। সেই মৃত মহামানবই এখন আমার শক্তি। তিনি ইংরেজদের শাসনের বিরুদ্ধে কতবারই না অনশন করেছিলেন। কোনওবার তিনদিন, কোনওবার সাত দিন একবার বোধ হয় পনের দিন গড়িয়েছিল। আমার সঙ্গে তাঁর তফাৎ, আমার অনশন স্ত্রীর শাসনের বিরুদ্ধে। তফাৎই বা বলি কেন! একই তো। স্ত্রীরাও তো 'হোয়াইট রেস'। ফর্সা রঙ আর সমান অত্যাচারী।

গান্ধীজী অনশনের সময় কি শুয়ে পড়তেন। আমার কাছে তাঁর জীবনের ঘটনাবলীর ছবি সমন্বিত একটা অ্যালবামও আছে। টেনে বের করে আনলুম। বেশ বড়সড়। এই তো একটা ছবি। সাদা বিছানায় সাদা চাদর গায়ে শুয়ে আছেন। উঁচু বালিশে মাথা। মাথার কাছে তাঁর স্ত্রী। তার মানে অনশনে শোয়া 'অ্যালাউড'। অনশনেরও তো একটা শাস্ত্র আছে। সেই শাস্ত্র তৈরি করে দিয়ে গেছেন মহাত্মা গান্ধী। কত বড় দূরদর্শী ছিলেন। জানতেন দেশ থেকে ইংরেজ চলে যাবার পরেও স্ত্রী থাকবে। স্বামীদের অনশনের অস্ত্র নিয়ে লড়তে হবে।

অনশন মানে অনশনই। খাওয়া-দাওয়া কিছু চলবে না, এমন কি জল পর্যন্ত না। জিভ খুব শুকিয়ে গেলে জলে তুলো ভিজেয়ে একটু 'ময়েস্ট' করে দেওয়া যেতে পারে। এটা বইয়ে লেখা নেই। অ্যাটেনবরোর গান্ধী ছায়াছবি দেখে জেনেছি। অনশন ভঙ্গের দিন এক গেলাস কমলালেবুর রস তোমাকে খেতেই হবে। তা না হলে ভোঁচকানি লেগে মৃত্যু। হাঁউ হাঁউ করে 'সলিড' কিছু খেলেই শেষ খ'ওয়া।

যাক শোওয়া যখন যায় আর সেইটাই যখন অনশন-বিধি, তাহলে

দোতালায় বসার ঘরের পরিচ্ছন্ন সোফা-কাম-বেড-এ শেষ শয্যা গ্রহণ করি—করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। হয় মন্ত্রের সাধন না হয় শরীর-পাতন। মন্ত্রটা অবশ্য তেমন জোরদার নয়—স্ত্রীর সঙ্গে লড়াই। ব্যাখ্যা করলে একটু গুরুত্ব অবশ্য পায়—স্ত্রী মানে শক্তি। চণ্ডী বলছেন, স্ত্রীয়া সমস্তা সকলা জগৎসু। তার মানে—নারী আদি-শক্তি। সেই শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পৃথিবীর যাবতীয় স্ত্রী তৈরি করেছেন সেই বিশ্বস্রষ্টা। সেই স্ত্রীদের নানা চেহারা, ভাব আর ভাষা। সেই শক্তি, সেই আদি আর আদ্যাশক্তির সঙ্গে যে ধর্ম যুদ্ধ, যুদ্ধস্থলের নাম, সংসার সমরাঙ্গন। আর অস্ত্র হল অনশন। এই নিয়ে ছেলে-মেয়েরা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করলেও, ব্যাপারটা তুচ্ছ, ছেলেখেলা নয়। স্বদেশী আন্দোলনের চেয়েও মহান। সে আন্দোলন স্বাধীনতার পরই খতম। এই আন্দোলন চলবে সৃষ্টির শেষ পর্যন্ত। সংসার নামক অনাসৃষ্টি যতদিন থাকবে ততদিন। যৌবনে মানুষ হেসে লেসে করে বিয়ে করবে। তারপর ফুলশয্যার ফুল শুকোতে না শুকোতেই শুরু হয়ে যাবে ফাইটিং। এক জোড়া দ্বন্দ্বগুলীর জীবনযুদ্ধ।

বিচার-বিশ্লেষণের পর মনে বেশ আধ্যাত্মিক-শক্তি জড়ো হবে। শুধু চোখ রাখলুম আমার প্রতিযোগী কি করছে। জল বা পান খাচ্ছে কি-না! সংসারী মানুষের চা-ও এক দুর্বলতা। কাকের কা কা-র মত মধ্যবিত্তের চা-চা। এদিকে চাচা আপন প্রাণ বাঁচা, ওদিকে ক্ষণে ক্ষণে, ওরে চা চাপা।

মহিলা মারাত্মক, জলের ধারে কাছে গেলেন না। মস্ত বড় পানসত্ত কিন্তু একটাও পান খেলেন না। চায়ের জন্যে কোনও চাতকতা দেখা গেল না। অথচ আমার একই সঙ্গে জল খেতে ইচ্ছে করছে। চা খেতে ইচ্ছে করছে। ধমক ধামক দিয়ে সেই সব ইচ্ছে তাড়ালুম। মনকে দেখালুম-মন দেখ ওই নারীকে, কি সাংঘাতিক মনের জোর। আগের জন্মে কোনও জৈন সাধু ছিল না তো? মন দেখে শেখো। শেষে মন, কোথাও কিছু নেই, বলে কি না, মিছরি খাবো 'সে কি রে! মিছরি খাবি কি রে? মিছরি কেউ খায়! শেষে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করলুম। আর ঘুমিয়েও পড়লুম।

সন্ধ্যের সময় কপালগুণে এসে হাজির হলেন আমাদের কুল-পুরোহিত। তাঁর পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ পরের দিন। যজমান তো, 'তুমি কাল একবার এস বাবা।'

'আমি তো পারবো না ভট্চাজ মশাই। আমার নির্জলা উপবাস চলেছে।'

কেন? ও বৈশাখ মাস। তুমি বুঝি পঞ্চতপা করছ। আহা! তা করবে না! কোন বংশের ছেলে তুমি। প্রথম দিকটায় তুমি যখন ভেস্তে গিয়ে, নিজের পছন্দ করা পাত্রীটিকে বিয়ে করে আনলে, তখন তোমার পিতাঠাকুর বড় আঘাত পেয়ে

বলেছিলেন, বংশের কুলাঙ্গার। আমি মনে মনে হেসেছিলুম—জানতুম তুমি ফিরবে। বোম্বাই আম গাছে, বোম্বাই আমই হবে। আমার বিশ্বাস আজ অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। তা তোমার উপবাস ভঙ্গের দিন একটা খবর দিও। কিছু অনুষ্ঠান তো আছেই। তা না হলে ব্রতের ফল বিফলে যাবে।

তিনি চলে গেলেন। আমি আবার শুয়ে পড়লুম। এখন এনার্জি খরচ করা চলবে না। মানুষ একটা ব্যাটারি। যত ওঠা-বসা-ঘোরা-ফেরা করবে ততই খরচ হয়ে যাবে। শুয়ে শুয়ে একটা ধর্মপুস্তক পড়ার চেষ্টা করলুম। খাদ্যের শক্তিতে কি হয়। মল, মূত্র, কফ, পিত্ত। যাবতীয় কামনা-বাসনার উৎসে, কলা, মুলো, ঘেঁচু, মেঁচু। আধ্যাত্মিক খাদ্যই তো খাদ্য। মনের শক্তিই তো শক্তি। আমি যদি বেঁচে যাই, তাহলে সংসার পানসে হয়ে যাবে। বৈরাগ্যের পথই আমার পথ, তখন বউকে মনে হবে কবিরাজী পাঁচন। উপকারী কি না জানি না, তবে অখাদ্য।

রাতটা কেটে গেল। শেষ রাতে আবার স্বপ্নও দেখলুম। একটা গাধা, তার পিঠে অনেক বোঝা। গাধাটা ধুঁকতে ধুঁকতে চলেছে আমিও চলেছি তার পেছন পেছন মাঠ-ময়দান পেরিয়ে। একটা আটচালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। দেখি বসে আছেন মহাদেব স্বয়ং বাঘ ছাল পরে। ভামটাম মাথা। পাশে ত্রিশূল। 'তিনি বলছেন, কি রে গাধা! এই বুড়ো বয়সে এলি'। আমি ইংরেজিতে উত্তর দিতে গেলুম-'বেটার লেট দ্যান নেভার।' আমার গলা দিয়ে তিনটে গাধার ডাক বেরলো, হ্যাঁককো, হ্যাঁককো। অবাক কাণ্ড, দেখি কি আমি আর গাধা এক হয়ে গেছি একটা অশান্তি নিয়ে ঘুম থেকে উঠলুম। আমার ভেতর গাধাটা ঢুকলো না, আমি গাধাটার ভেতর ঢুকে গেলুম!

বেলা বারোটা নাগাদ আমার অনশন আর স্ত্রীর বিরুদ্ধে জেহাদ নয়, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসায় পরিণত হল। কারণ আমার বাঁ দিকটা দুর্বল মতো হয়ে গেল। বাঁ হাত আর বাঁ পা-য় তেমন জোর পেলুম না ঃ কেমন যেন থ্যাস থ্যাস করছে। মাথাও কেমন যেন ঝিম মেরে আসছে। সেই মুহূর্তে আমার রাগ বিদ্বেষ সব উবে গেছে। তুচ্ছ সংসার তলিয়ে গেছে। নিজের কাছে তখন নিজে এক গিনিপিগ। দেখি না, একটু একটু করে কি কি যায়। পুরো ব্যাপারটা ঘুরে গেল জীবনবিজ্ঞানের দিকে। আহারের প্রয়োজন আছে কি না। কতটা আহার প্রয়োজন। মধ্য বিত্তের ফ্যামিলিতে একটা চাকুরীজীবী সকালে কোনও রকমে নাকে গোঁজে। সারাদিন সে পাখি। এই ছোলা, মুড়ি, বাদাম-বাদাম আর চা নামক তরল পদার্থ খেয়ে দিন চালায়। রাতেও আহামরি কিছু তেমন হয় না। মাঝেমধ্যে কোনও উপলক্ষ্যে খাওয়ার মতো খাওয়া হয়। প্রোটিন, ভিটামিন, ক্যালোরি সব মিলিয়ে

হল একটা। তা প্রতিদিনের ওই আহারেই শরীর চলে ফিরে বেড়াচ্ছিল, ছোট মতো একটা ভুঁড়িও নামছিল। আমি মনে করতুম না খেয়েই তো বেশ আছি। তা নয়, ওই খাওয়াটাও খাওয়া ছিল। যাই হোক, এখন আমি দর্শক। আমার শরীরের দর্শক। কিভাবে একে একে সব পড়বে। বাঁ দিকে শুরু। ডান দিকটা আছে এখনও। এই যে শুয়ে শুয়ে কাগজ ধরে চোখের সামনে তুলে পড়ছি থেকে থেকে বাঁ দিকটা ভেতরে পড়ছে। কিছুতেই ধরে রাখা যাচ্ছে না! দৃষ্টিও ঘোলাটে হয়ে আসছে। যেন রাজকাপুর ধোঁয়া ছেড়েছেন আর নার্গিস নাচছেন।

সন্ধ্যের সময় মনে হল, আমি একটা বোতল। আমার দুটো পাশ নেই। গোল ব্যারেল, লম্বা একটা গলা। আমাদের অনশনের খবর বাড়ি থেকে ছড়িয়ে গেছে পাড়ায়। যাবেই, বাড়ির কাজের লোক হল মধ্যবিত্তের সংসার সংবাদপত্রের রয়টার। সেই একেবারে হেডলাইন করে ছেড়ে দিয়েছে। তাঁরা সব একে একে এলেন। মেয়েরা চলে গেলেন আমার বউয়ের দিকে। পুরুষরা এলেন আমার দিকে। এ-ঘর আর ও ঘর। মাঝে পাতলা পার্টিশানের ব্যবধান মাত্র। চোখ আমার ঘোলাটে। দেহের দুটো পাশ পড়ে গেছে; কান দুটো কিন্তু ঠিক আছে। এই ভাবেই একে একে যায়। প্রথমে বাঁ দিক, তারপর ডান দিক, অবশেষে চোখ। কান দুটো কখন যায় দেখি। ক'দিন অনশনে, মাথাটাকে ঠিক রাখছি রাগের খোঁচা মেরে। ক্রোধরূপী সর্পের ছোবলে বোধটাকে সজাগ রাখছি। তা না হলে 'কোমাটোজে' চলে যাবো। যেতে চাই সজ্ঞানে। রেকর্ডের গান যে-ভাবে 'ফেড আউট' করে। আমি যাবই, আমি যাবো-যাবো-যাবো।

কানে আসছে আমার প্রতিবেশী মহিলাদের কণ্ঠস্বর। তাঁরা আমার স্ত্রীকে বলছেন কি আর করবে বলো, অমানুষের হাতে পড়লে এই রকমই হয়।'

আচ্ছন্ন অবস্থাতেই আমার ফোঁস 'কোন শালা অমানুষ।'

সঙ্গে সঙ্গে আমার তরফের প্রতিবেশী পুরুষের একজন আমার বুক চেপে বললেন—উঁহু! শেষ সময়ে রাগে না, রাগে না। এই যে শালা বললে, অমনি তোমার শালার কথা মনে পড়ল। এখন যদি, গয়া পাও তাহলে তোমাকে কিন্তু শালা হয়ে জন্মাতে হবে। মানে ডিমোশনাল হল। স্বামী থেকে শালা।'

আমার সাপোর্টে একজন বললে, 'স্বামী হওয়ার চেয়ে শালা হওয়া হাজার গুণ ভাল। দেখছি তো আমার শ্যালকটি আমার সব চৌপাট করে দিলো। লাস্ট আমার নতুন সাইকেলটা ছিল, সেটাও কাল হাওয়া।'

গম্ভীর গলায় একজন বললে, 'পরিবেশটা নষ্ট করবেন না আপনারা। এই সময় শুধু তাঁর কথা বলুন। ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে

আসে। কাকাবাবুর যা অবস্থা, হার্ডলি আর ঘণ্টা তিনেক।'

তার কথাও শেষ হল আর ওঘর থেকে এসে ঢুকলেন আমাদের পাড়ার বিখ্যাত খাণ্ডারণী মহিলা। খাণ্ডারণী হলেও ভদ্রমহিলার গুণ অনেক। পরোপকারী। লোকের বিপদে আপদে সবার আগে তিনিই এগিয়ে যান। সবাই তাঁকে ভয় আর ভক্তি, দুটোই করেন। আমি মিটিমিটি চোখে দেখছি তিনি আমার সামনে এসে কোমরে দুটো হাত দিয়ে দাঁড়ালেন। দেখতে-শুনতে বেশ ভালই। চেহারায় বেশ একটা চটক আছে। বড় বড় মা দুর্গার মতো চোখ। ঘাড়ের কাছে ইয়া বড় এক খোঁপা লাট খাচ্ছে। চুপ করে থাকলে জগদ্ধাত্রী, মুখ খুললে রণচণ্ডী। আমাদের পাড়ার কমান-বউদি।

তিনি আঙুল উঁচিয়ে বললেন, 'ইয়ারকি হচ্ছে, বুড়ো বয়সে। সারা দেশে অশান্তির শেষ নেই। পাঞ্জাবে-খালিস্তানী। কাশ্মীরে-কাশ্মীরী। ওদিকে রামশিলা, বাবরি মসজিদ। মানুষ পটাপট মরছে। আর এঁরা দেবা-দেবী একজন এঘরে দেয়লা করছেন, আর একজন ওঘরে পেছন উল্টে পড়ে আছেন। এ পাড়ায় ওসব চলবে না। গণধোলাই হবে, গণধোলাই। খুব হয়েছে, উঠে বসুন।'

আমার 'ক্লাবে'-র একজন বললে, 'ওঠার ক্ষমতা নেই বউদি। দুটো অঙ্গই পড়ে গেছে।'

'তাই না কি? কত ভিরকুটিই জানে এই মাঝবয়সী মিনসেরা। সারাটা জীবন শুধু জ্বালাবে।' ভালোয় ভালোয় উঠে বসুন, নয়তো সকলের সামনে বেইজ্জত করে দোবো। আমি সব পারি। এইসব প্যাস্তাখ্যাঁচা লোককে কি করে শায়েস্তা করতে হয় আমি জানি।'

ভয়ে ভয়ে উঠে বসলুম। মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। আমার সামনেই ডুরে শাড়ি পরা বউদির বুক। পেট। মরতে মরতেও শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল। অনশন বিজ্ঞান নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলুম বলেই মনে হল বা চরম একটা সত্যের উপলব্ধি হল—আটচল্লিশ ঘণ্টা নির্জলা উপবাসে থাকলেও প্রবল একটা ইন্দ্রিয় বেশ টগবগেই থাকে।

বউদি আমার মাথাটা বুকে চেপে ধরে বললেন 'টেকো বুড়ো আর কত ভিরকুটি হবে। অমন দেবীর মতো বউটাকে বিধবা করার ইচ্ছে হয়েছে। একালে আর বিধবা হয়ে আলো চালের পিণ্ডি গেলে না, স্বামীর ছবির সামনে সন্ধে বেলা ধূপ জ্বালিয়ে আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু বলে গান গায় না।'

বুকে আমার মুখ জুবড়ে গেছে। অনেক দিনের আশা। আবার লজ্জাও করছে। পাঁচ জনের সামনে।

বউদি হেঁকে বললেন, 'অনশন ভঙ্গ।'

আমার সাপোর্টাররা বললেন, 'তাহলে তো কমলালেবুর রস চাই।'

খোঁজপাত করে দেখা গেল, কমলালেবু, অরেঞ্জ স্কোয়াশ কিছুই নেই। আনাজের ঝুড়িতে গোটাকতক করলা পড়ে আছে। তাই হোক। করলাও তো 'ফ্রুট'। করলার জুস খেয়ে অনশন ভঙ্গ হবে। তারপর ঠিক হল, পাতলা [illegible] আর সরু চালের গরম গরম ভাত। একটু গাওয়া ঘি। শোনা মাত্রই [illegible] ছেলেবেলার অবস্থা হল। পেটখারাপের উপবাসের পর ন্যাংলা সিঙ্গি মাছের ঝোল দিয়ে এক থালা বাত উড়িয়ে মনে হত পেটখারাপের কি আনন্দ।

মহিলারা ডাকাত পড়ার মতো রান্নাঘরে ঢুকে পড়লেন। কাটা, ছেঁড়া, [illegible] ফোঁটানো, নিমেষে সব শেষ। খাবার টেবিলে সব সাজানো হয়ে গেল। আমার সাপোর্টাররা আগেই কেটে পড়েছে। নারীবাহিনী এখন দু'ভাগ। একদল আমাকে নিয়ে, আর একদল আমার বউকে নিয়ে ঢুকলো। এমন দর্শনীয় আহার জীবনে হয়নি।

আমি এইবার খুব সাবধানী। শেষ মুহূর্তে হারতে চাই না। ম্যাচ ড্র হবে। আমি বললুম, 'দু'জনে একসঙ্গে খাবার মুখে তুলবো। আপনারা, ওয়ান-টু-থ্রি বলবেন। তা না হলে, কৌশল করে আমাকে হারিয়ে দেবে।'

'বেশ তাই হবে।' বলে বউদি তিন গুণলেন। দু'জনের হাত উঠছে [illegible] নাড়ু নিয়ে। যেই আমি ঠোঁটের কাছে এনে খাওয়ার ভঙ্গি করেছি, খাইনি কিন্তু, আমার বউয়ের হাত নেমে এল। সঙ্গে সঙ্গে আমি চিৎকার করে বললুম, 'ওই দেখুন, খেল শুরু হয়ে গেছে।' বউদি বললেন, 'বউটাও তো কম শয়তানী নয়।'

তখন ঠিক হল, একসঙ্গে দুটো নাড়ু তিন গোণার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মুখে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। তাই হল। ভঙ্গ হল অনশন।

তারপর সে কি হ্যাঁকো-প্যাঁকো প্রেম আমাদের। যেন আবার নতুন করে ফুলশয্যা হচ্ছে আমাদের। আয় ভাই কানাই, মনের দুঃখ কাহারে জানাই। তবু পিঁপড়ের স্বভাব যাবে কোথায়। বললে, 'বউদির বুক কেমন লাগল? খুব মিষ্টি, তাই না।'

পাঁচ মিনিটের ভালবাসা 'ফিনিশ'। দুজনে দু'পাশ ফিরে শুলুম। পিঠে পিঠ ঠেকে রইল। মনে মন। মাঝখানে কলহের মাখন। ওপাশ থেকে পাগলি বললে, 'তুমি খেলে না কেন?' খেলেই পারতে!'

আমি বললুম, 'তুমি না খেলে খাই কি করে?'

আমার বউ গুড়ুম করে পাশ ফিরল। আমি হয়ে গেলুম একটা পাশ বালিশ! পৃথিবীটা কত ছোট!